দুর্গা দুর্গতিনাশিনী

- স্বামী দিব্যনাথানন্দ

আমরা বাঙ্গালীরা প্রতি বছর শরৎকালে মা দুর্গার আরাধনা করে থাকি। শুধু বাংলাতেই নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও দেবী দুর্গা ভিন্ন ভিন্ন নামে ও রূপে পূজিতা। কাশ্মীরে ও দাক্ষিণাত্যে 'অম্বা' ও 'অম্বিকা' নামে, গুজরাটে 'হিঙ্গুলা' ও 'রুদ্রাণী' নামে ও মিথিলায় 'উমা' নামে পূজিত হয়ে থাকেন। বাংলায় যেমন শারদীয়া দুর্গোৎসব, অন্যান্য প্রদেশে এই উৎসব 'নবরাত্রি' নামেও পরিচিত। আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত নয় রাতে পূজা হয় বলে এই নামকরণ।

কিন্তু আমরা জানি কি, এই দুর্গাপূজার তত্ব? তাঁর আরাধনা কেন ও কিভাবে করা হয়?

ভগবানকে বিভিন্ন ভাবে আরাধনার কথা আমরা জানি। সখ্য-ভাব, বাৎসল্য-ভাব, মধুর-ভাব, দাস্য-ভাব। তেমনি মাতৃ-ভাবে ভগবানকে আরাধনা করাও একটি শাস্ত্র-সম্মত পথ। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ইত্যাদি সাধকরা মাতৃরূপে ভগবানের আরাধনা করে ভগবৎ-কৃপা লাভ করেছিলেন। বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস মাতৃ-উপাসনায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর কথায়, "তাঁর কৃপা পেতে হলে আদ্যাশক্তিরূপিনী তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়। তিনি মহামায়া। জগতকে মুগ্ধ করে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। তিনি অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছেন। সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়...সেই আদ্যাশক্তির ভিতরে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই আছে,-অবিদ্যা- মুগ্ধ করে; অবিদ্যা- যা থেকে কামিনী-কাঞ্চন- মুগ্ধ করে। বিদ্যা- যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম-ঈশ্বরের পথে লয়ে যায়...সেই অবিদ্যাকে প্রসন্ন করতে হবে। তাই শক্তি পূজার পদ্ধতি'। শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে শক্তি-পূজার তাৎপর্য পরিষ্কার রূপে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

'দুর্গ' শব্দের সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যোগে দুর্গা শব্দটি তৈরী হয়েছে। 'দুর্গ' শব্দের অর্থ বাধা বা বিঘ্ন। আর একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে এর অর্থ দাঁড়ায় আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ। দুর্গা- অর্থাৎ যিনি এই মহাবিঘ্নের পারে নিয়ে যেতে সন্তানকে সাহায্য করেন। বাহ্য জগতের নানা রকম দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মানুষ মহাশক্তি মহামায়ার শরণ নেয়। অন্যদিকে একজন সাধক, যে সমস্ত অনিত্য ভোগসুখ পরিহার করে ভগবৎ দর্শন লাভ করতে চায়, তার কাছে সাধনাই যুদ্ধ এবং কাম-ক্রোধ-লোভ ইত্যাদি তার পরম শত্রু। ভেতরের শত্রুদের পরাভূত করার উদ্দেশ্যে সে ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করে। মা জগজ্জননী ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সবই দিতে পারেন, তাঁর শরণাগত হলে মা নিজে সন্তানের পথের বাধাসকল দূর করে দেন। তাই শ্রীশ্রীচণ্ডীতে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন: 'ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি। তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্'- যখনই দানবের আবির্ভাব হবে আমি আবির্ভূত হয়ে দেবশত্রু বিনাশ করব। একই কথা আমরা গীতাতেও পাই। ভগবান যুগপ্রয়োজনে বার বার ধরাধামে অবতীর্ণ হন- 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং, ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে'।

দুর্গাপূজার প্রচলন কিভাবে শুরু হল? এর উত্তরে নানা কাহিনী আছে। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দুটি :

রাজা সুরথ ছিলেন পৃথিবীর রাজা, নিজসন্তান বোধে প্রজাদের পরিপালন করতেন তিনি। কিন্তু একবার তাঁর মন্ত্রী ও অমাত্যরা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে, রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তিনি রাজ্যের বাইরে একটি জঙ্গলে মেধা নামক এক ঋষির আশ্রমে এসে উপনীত হলেন। কিন্তু রাজা সেখানে এসেও, তাঁর আত্মীয়বর্গ, রাজকোষ ইত্যাদির জন্যই দুশ্চিন্তা করতে থাকলেন। আশ্রমে ঘুরতে ঘুরতে কিছুদিন পর তিনি সমাধি নামক এক বৈশ্যকে সেই আশ্রমে দেখতে পেলেন। তার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলেন, আসাধু স্ত্রী-পুত্রদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে তিনি এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সমাধি রাজাকে জানালেন, স্ত্রী-পুত্রদের দ্বারা বিতাড়িত হয়েও তিনি এখানে তারা কে কেমন আছেন, ইত্যাদি নানা দুশ্চিন্তায় কাল কাটাচ্ছেন। আশ্চর্য হয়ে তাঁরা মেধা ঋষির কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন, 'যারা আমাদের প্রতি অসৎ ব্যবহার করেছে, তাদের প্রতি আমরা মমতা কেন ছাড়তে পারছি না? কি এর কারণ'? মেধা ঋষি বললেন, 'মহামায়ার সম্মোহিনী শক্তির প্রভাবে মানুষ বদ্ধ। সমস্ত প্রাণীকুলের একই দশা। আবার এই মহামায়াই প্রসন্না হলে তিনি সন্তানকে অভীষ্ট বর প্রদান করেন'। তখন তিনি চণ্ডীর তিনটি উপাখ্যান তাঁদের উভয়কে শোনালেন। মধুকৈটভ বধ, মহিষাসুর-বধ ও শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ। এগুলির মধ্যে মহিষাসুর-বধ উপাখ্যানটিই সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়। মেধা ঋষির দ্বারা বর্ণিত চণ্ডীর তিনটি উপাখ্যান শোনার পর সুরথ ও সমাধি তিন বৎসর গভীর তপস্যায় ও সাধন-ভজনে মগ্ন হন। দেবী তাদের উভয়কে দর্শন দিয়ে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করতে বললেন। সুরথ রাজা তাঁর অপহৃত রাজ্যের উদ্ধার প্রার্থনা করলেন আর সমাধি প্রার্থনা করলেন, 'আমি' 'আমার' বোধের জন্য যে সংসারে আসক্তি হয় তা যেন তাঁর চিরনিবৃত্তি হয়। মহামায়া তাদের উভয়েরই মনোকামনা পূরণ করেছিলেন।

বসন্ত কালে তারা দেবী-দুর্গার পূজানুষ্ঠিত করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে বাসন্তী পূজা নামে প্রচলিত হয়।

চণ্ডীতে বর্ণিত মহিষাসুরের উপাখ্যানটি এইরূপ:

মহিষাসুর নামক এক ভীষণ অসুরের অত্যাচারে দেবতারা স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে শিব ও বিষ্ণুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে অসুরকুলের অত্যাচারের বর্ণনা করলেন। সেই বর্ণনা শুনে তাঁরা ক্রোধান্বিত হলে, তাঁদের শরীর থেকে তেজ নির্গত হতে থাকল। তাঁদের সম্মিলিত শক্তির ঘনীভূত রূপ থেকে আবির্ভূত হলেন এক দেবী। বিভিন্ন দেবতার শক্তি দ্বারা দেবীর বিভিন্ন শারীরিক অঙ্গ তৈরি হল, যেমন দেবাদিদেব মহাদেবের শক্তিতে মুখমণ্ডল, ইন্দ্রের তেজে শরীরের মধ্যভাগ, ব্রহ্মা তাঁর তেজ দ্বারা রচনা করলেন দেবীর চরণযুগল, ইত্যাদি। এই দেবী দশভূজা। প্রতিটি হাতে এক একজন দেবতা এক একরকম অস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়ে দেবীকে সজ্জিত করলেন। মহাদেব দিলেন ত্রিশূল, বিষ্ণু দিলেন চক্র, দেবরাজ ইন্দ্র দিলেন ঘণ্টা, ব্রহ্মা কমন্ডলু, ইত্যাদি। তারপর কিভাবে তিনি মহিষাসুর বধ করলেন তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে চণ্ডীতে। মহিষাসুর কে বধ করে তিনি মহিষাসুর-মর্দিনী নামে আখ্যায়িত হলেন, দেবতাদের দুর্গতি দূর করে, তিনি হলেন দুর্গতিনাশিনী।

মহিষাসুর-মর্দিনী ছাড়াও শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীদুর্গার আরও অন্যান্য রূপের বর্ণনা আমরা দেখতে পাই। দুর্গারূপে যেমন তিনি মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন, মহাকালী রূপে বধ করেছিলেন মধুকৈটভকে, আবার কৌশিকী রূপে বধ করেন শুম্ভ নিশুম্ভকে। দেবী কবচে পিতামহ ব্রহ্মা দুর্গার নয়টি নাম করেছেন- শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘন্টা, কুষ্মান্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রী, মহাগৌরী এবং সিদ্ধিদাত্রী। কিন্তু এঁদের মধ্যে মহিষাসুর-মর্দিনী দুর্গাই সমধিক পরিচিতা ও পূজিতা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণনা অনুযায়ী, রাবণ ছিলেন পরম শিবভক্ত, আর দেবী দুর্গা তাকে রক্ষা করতেন। যখন রাবণ বধের প্রয়োজন হল, তখন ব্রহ্মা রামচন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন, শিবের স্ত্রী পার্বতীকে তুষ্ট করতে, তাহলে রাবণ বধ সহজ হবে। সেজন্য শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালের আশ্বিন মাসে বোধন ও পূজা সম্পন্ন করলেন।

বসন্তকাল ও শরৎকাল- এই দু'বার দুর্গাপূজার রীতি প্রচলিত আছে। একমতে, এই দুই ঋতুতেই নানা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়ে থাকে। অনেকেই মৃত্যু মুখে পতিত হন, তাই দেবীকে তুষ্ট করে কালের গ্রাস থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য এই দুই সময়ে দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পুরাণ মতে, দেব-দেবীরা আষাঢ় থেকে কার্তিক পর্যন্ত চার মাস নিদ্রায় মগ্ন থাকেন। সেজন্যই, দেবীকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করার জন্য, ষষ্ঠীর দিন বোধন করার রীতি প্রচলিত

আছে। অকালের পূজা, তাই শরৎকালের এই পূজাকে বলা হয় অকালবোধন। বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাসের পর প্রধান পূজা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর দিন সম্পন্ন হয়। অষ্টমীদিন কুমারী পূজা ও অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে সন্ধিপুজা দুর্গাপূজার দু'টি বিশেষ অঙ্গ। অষ্টমী তিথির শেষ চব্বিশ মিনিট ও নবমী তিথির প্রথম চব্বিশ মিনিটে এই পূজা সম্পন্ন করতে হয়। পুরাণে আছে, এই সন্ধিক্ষণে রাবণের মুণ্ডচ্ছেদ করেছিলেন রামচন্দ্র।

দেবী দুর্গা তাঁর পুত্র কন্যাদের সাথে মর্ত্যে এসে আমাদের পূজা গ্রহণ করেন, তাই আমরা দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে লক্ষী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশেরও একত্রে সমাবেশ দেখতে পাই। মা লক্ষী ধন-ঐশ্বর্যের প্রতীক, মা সরস্বতী জ্ঞান ও বিদ্যা, গনেশ সিদ্ধি দাতা ও কার্তিক শৌর্য ও বীর্যের প্রতীক। মা দুর্গার পায়ের নীচে সিংহ ও অসুর বিরাজিত। সিংহ ও অসুর সমস্ত পশুকুল ও পাশবিক শক্তির প্রতীক। পাশবিক ভাবকে সম্পুর্ণ পরাভূত করতে না পারলে দেবী দুর্গার আশীর্বাদ পাওয়া যায় না।

আমরা মা দুর্গার আরাধনা করি কেন? আমাদের জীবনে যা কিছু শুভ ও মঙ্গল ঘটে, তাঁর শক্তিতেই ঘটে, তাঁরই প্রেরণাতে আমরা পরা বিদ্যা, ধন ও ঐশ্বর্য লাভ করি। ভৌতিক জগতে যা কিছু সাফল্য আমাদের চোখে পড়ে, তা সব তাঁরই শক্তিতে। আবার সুখ-দুঃখ পূর্ণ এই সংসারের পারেও তিনিই শরণাগত ভক্তকে নিয়ে যান। তাই আমরা দেখতে পাই, শ্রীশ্রীচণ্ডীর চতুর্থ অধ্যায়ে আছেঃ

'ধর্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্মাণ্য-
ত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতি করোতি।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতীপ্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবী তেন'।।

অর্থাৎ, দেবী, আপনি সদা অভীষ্টদায়িনী। আপনি যাদের প্রতি প্রসন্না হন, তারা সর্বত্র সম্মানিত হয়, তাদের ধন ও সুখ্যাতি বৃদ্ধি হয় এবং তাদের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ হ্রাস হয় না। তাদের স্ত্রী-পুত্র-ভৃত্যাদি নিরাপদে থাকে এবং তারাই ধন্য।

'দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা'।।

দেবী, দুঃসময়ে আপনাকে স্মরণ করলে আপনি সকলের ভয় নাশ করেন। সুসময়ে বিবেকীগণ আপনাকে চিন্তা করলে আপনি তাদের সুবুদ্ধি প্রদান করেন। হে দারিদ্র্যহারিণি, হে দুঃখবিনাশিনী, সকলের কল্যানবিধানার্থ সর্বদা দয়ার্দ্রচিত্ত আপনি ভিন্ন আর কে আছেন?

তাই, হে সর্বমঙ্গলস্বরূপা, সর্বাভীষ্টসাধিকা, একমাত্র শরণযোগ্যা, ত্রিভুবন-জননী, আপনাকে প্রণাম।

হে দেবী, আপনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের শক্তিরূপিনী। আপনি সনাতনী ও ত্রিগুণের আধারভূতা (নির্গুণা) অথচ ত্রিগুণময়ী। হে নারায়ণী, আপনাকে প্রণাম!

হে দেবী, আপনি শরণাগত, দীন ও আর্তগণের পরিত্রাণ-পরায়ণা এবং সকলের দুঃখ (জন্মমরণাদি) নাশিনী। হে নারায়নী, আপনাকে প্রণাম।

রবীন্দ্র রচনায় শারদ উৎসব

- মানিকচন্দ্র ঘোষ

এ বছর ফিরে দেখি রবীন্দ্র রচনায় শারদ উৎসব।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মে বিশ্বাসী। তিনি ছিলেন নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক। বিশ্বময় যে সত্য বিরাজমান সেই সত্যকে খুঁজতে রবীন্দ্রনাথ শুধু মন্দিরের সীমিত পরিসরে সীমাবদ্ধ না থেকে খুঁজেছেন আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে। তাই দুর্গা পূজাকে কেন্দ্রে রেখে যে শারদ উৎসব তা রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন স্বচ্ছ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে। ছোট, বড়, ভালো মন্দ, সংস্কার, ও কুসংস্কার, শারদ উৎসবের প্রতিটি ঘটনাই স্থান পেয়েছ তাঁর রচনায়। তিনি দেখেছেন শারদ উৎসব কেবল মন্দিরে নয় আকাশে, বাতাসে, মানুষের মনে ও জীবনযাত্রায়।

ঈশ্বরের উপাসনায় মত পার্থক্য থাকলেও, এটা সত্যি, যে কোনো উৎসবে রবীন্দ্রনাথের ছিলো অগাধ বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের 'উৎসব' প্রবন্ধে তাঁর এ বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখি। তিনি অনুভব করেছিলেন, আমাদের প্রতিদিনের স্বার্থের মধ্যে, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে পূর্ণতা নাই, পরিতৃপ্তি নাই, তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য পাই না, তার রাগিণী হারিয়ে ফেলি; কিন্তু যখন এ খণ্ডগুলোকে মিলিয়ে দেখি, তখন সেই মিলনেই আমরা সত্যকে উপলব্ধি করি। তাই বিশ্বাস করতেন "মিলনের মধ্যে যে সত্য, তাহা কেবল বিজ্ঞান নহে তাহা আনন্দ, তাহা রসস্বরূপ, তাহা প্রেম। তাহা আংশিক নহে, তাহা সমগ্র; কারণ, তাহা কেবল বুদ্ধিকে নহে, তাহা হৃদয়কেও পূর্ণ করে। যিনি নানাস্থান হইতে আমাদের সকলকে একের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, যাঁহার সম্মুখে, যাঁহার দক্ষিণ করতলচ্ছায়ায় আমরা সকলে মুখোমুখি করিয়া বসিয়া আছি, তিনি নীরস সত্য নহেন, তিনি প্রেম। এই প্রেমই উৎসবের দেবতা--মিলনই তাঁহার সজীব সচেতন মন্দির।"

বস্তুতপক্ষে ব্রাহ্ম ধর্মে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথের চেতনায়, যে কোনো উৎসবের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে অমেয় সত্য যা অমূর্ত শাশ্বত প্রেমের মূর্ত প্রকাশ, যা সহস্র বাঁধন মাঝে এনে দেয় মুক্তির স্বাদ; পরম শক্তির সাথে মিলনের অখণ্ড আনন্দ। তাই রবীন্দ্রনাথ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সকলকে উৎসবে সামিল হতে বলেছেন। জানিয়েছেন;

"শক্তিরূপে হেরো, তাঁর,
আনন্দিত, অতন্দ্রিত,
ভূর্লোকে ভূবর্লোকে--
বিশ্বকাজে, চিত্তমাঝে
দিনে রাতে।
জাগো রে জাগো জাগো
উৎসাহে উল্লাসে--
পরান বাঁধো রে মরণহরণ
পরমশক্তি-সাথে ॥"

রবীন্দ্র রচনায় প্রকৃতিতে শারদ উৎসবের শুরু বর্ষা শেষে; আকাশে কর্মহীন অলস সাদা মেঘের আনাগোনায়, সকালের ঘাসের ডগায় জমে থাকা শিশির বিন্দু তে অরুণ আলোর বিকিরণে, শষ্যক্ষেতের সজীবতায়; ভরা নদীর অমল জলধারের কলতানে; বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধে, আর বনে বনে কাশ ফুলের আন্দোলনে। বর্ষা শেষে শরৎ ঋতুর আবির্ভাব, প্রকৃতিতে পরিবর্তন, পুলক জাগায় সবার মনে; রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম নয়। তিনি গেয়ে ওঠেন -

"শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে।
আনন্দগান গা রে হৃদয়, আনন্দগান গা রে॥"

এ আনন্দঘন শারদ উৎসবে প্রকৃতিতে পট পরিবর্তন রবীন্দ্র ভাবনায় ও তাঁর রচনায় এনেছে এক অপূর্ব আলোড়ন। এ পুত লগ্নে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন বাংলার আনন্দ রূপিণী, কৈলাস বাসিনী শারদার আবির্ভাব। তিনি বিমুগ্ধ নয়নে উপভোগ করেছেন তাঁর সেই অপূর্ব সৌন্দয্য- তাঁর কণ্ঠহার হ'তে সোনার ছটায় চারি দিকে ঝলমল শারদ-কিরণ; প্রফুল্ল মালতী বনে প্রভাতে তাঁরই অমল শুভ্র অঞ্চল-বসন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাবলীল ভঙ্গিতে ঘোষণা করেছেন সেই আনন্দময়ীর আগমন তাঁর 'শারদা' কবিতায়।

"ছাড়িয়া অনন্তধাম সৌন্দর্য-কৈলাস, আসিছেন এ বঙ্গের আনন্দ-রূপিণী।"

বস্তুত পক্ষে শারদ উৎসবের কেন্দ্র বিন্দুতে যিনি আনন্দময়ী, যিনি দুর্গতিনাশিনী মহিষাসুরমর্দিনী মঙ্গলকারিণী মা দুর্গা - যিনি সত্য গুণে মহা সরস্বতী, রজো গুণে মহা লক্ষ্মীরূপিনী সনাতনী, তিনিই রবীন্দ্রনাথের চেতনায় বঙ্গ জননী। তাঁর উদ্দেশ্যে অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে, রবীন্দ্রনাথ "আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি" গানের ভিতর দিয়ে, তাঁরই বন্দনা গেয়েছেন।

"ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ।
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥"

মায়ের আগমনী গান, শারদ উৎসবের একটা বিশেষ অঙ্গ। এ গানে ঐশ্বর্যশালিনী জগৎধাত্রী মহিষাসুরমর্দিনী মা, ধনী, দরিদ্র, ছোট, বড় সব বাঙালীর অপার ভালোবাসার সজীবতায়, বাঙালীর চেতনায় প্রতীয়মান হন বাঙালী ঘরের আদরের দুলালী মেয়ে উমা হয়ে। তিনি অনায়াসে সব বাহুল্য ব্যতিরেকে বাঙালী মনের অর্গল খুলে অবলীলায় ঢুকে পড়েন হৃদয় মাঝে। উমাকে ঘিরে তাই বাঙালী ঘরে আনন্দের আর খুশির বাঁধ ভাঙ্গে। মা ও মেয়ে উমার কুশল জিজ্ঞাসায় ও সুখ দুঃখের গল্পে প্রতিবেশীদের আনাগোনায় যে আবেগ ও খুশির ঢেউ ওঠে তা বস্তুতঃপক্ষে মর্মস্পর্শী। বাংলার প্রতিটি ঘরের ও আঙিনার সেই খুশি ও আবেগের মূর্ত প্রতিফলন তাই বাংলার আগমনী গানে।

রবীন্দ্রনাথ সেই চিরন্তনী আগমনী গানের হৃদয় স্পর্শী ভাবনা ও আবেদনকে তাঁর সংবেদনশীল অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করেছেন তাঁর অনবদ্য "আগমনী" - তবে তা গানের সুরে নয়; কবিতার ছন্দে ও কথায় প্রকৃতির পট পরিবর্তনের পটভূমিতে।

"সুধীরে নিশার আঁধার ভেদিয়া ফুটিল প্রভাততারা।
হেথা হোথা হতে পাখিরা গাহিল ঢালিয়া সুধার ধারা।

মৃদুল প্রভাতসমীর পরশে কমল নয়ন খুলিল হরষে,
হিমালয় শিরে অমল আভায় শোভিল ধবল তুষারজটা।
খুলি গেল ধীরে পূরবদ্বার, ঝরিল কনককিরণধার,
শিখরে শিখরে জ্বলিয়া উঠিল, রবির বিমল কিরণছটা।

গিরিগ্রাম আজি কিসের তরে, উঠেছে নাচিয়া হরষভরে,
অচল গিরিও হয়েছে যেমন অধীর পাগল-পারা।

তটিনী চলেছে নাচিয়া ছুটিয়া, কলরব উঠে আকাশে ফুটিয়া,
ঝর ঝর ঝর করিয়া ধ্বনি ঝরিছে নিঝরধারা।"

উমার আসতে দেরি দেখে, মা মেনকার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙে। রবীন্দ্রনাথ, সেই ব্যাকুল মনের অস্থিরতা প্রকাশ করেছেন চিরাচরিত ঢঙে তাঁর 'আগমনী' কবিতায়।

"মুখে একটিও নাহিকো বাণী শবদচকিতা মেনকারানী

তৃষিত নয়নে আকুল হৃদয়ে, চাহিয়া পথের পানে।
আজ মেনকার আদরিণী উমা আসিবে বরষ-পরে।"

মা মেনকা রানী ও উমার কথপোকথনে কুশল জিজ্ঞাসায়,সংসারের সুখ দুঃখের কথা স্বাভাবিক ভাবে এসে পরে। রবীন্দ্রনাথের আগমনী কবিতায় সে কথাপোকথন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

"হাসিয়া কাঁদিয়া কহিল রানী, চুমিয়া উমার অধরখানি,
"আয় মা জননি আয় মা কোলে, আজ বরষের পরে।
দুখিনী মাতার নয়নের জল তুই যদি, মা গো, না মুছাবি বল্
তবে উমা আর, কে আছে আমার এ শূন্য আঁধার ঘরে?
সারাটি বরষ যে দুখে গিয়াছে কী হবে শুনে সে ব্যথা,
বল্ দেখি, উমা, পতির ঘরের সকল কুশল-কথা।'
এত বলি রানী হরষে আদরে উমারে কোলেতে লয়ে,
হরষের ধারা বরষি নয়নে পশিল গিরি-আলয়ে।"

শারদ উৎসব আগমনী গানেই শেষ নয়। শারদ উৎসব সুদূর প্রসারী। শারদ উৎসবের প্রভাব মানুষের মনে ও জীবনযাত্রায় সুগভীর। রবীন্দ্রনাথ সে প্রভাব লক্ষ্য করেছেন তাঁর সংবেদনশীল অনুভূতি দিয়ে। রবীন্দ্র রচনায় তা বিধৃত হয়ে আছে শারদ উৎসবকে ঘিরে তাঁর অজস্র গানে, গাথায়, কবিতায় ও অন্যান্য রচনায়। 'পূজার সাজ' ও 'ছুটির আয়োজন' তারই এক উদাহরণ।

বস্তুতঃপক্ষে এ সব রচনায় মায়ের পূজাকে ঘিরে বর্ষা শেষে প্রকৃতিতে পট পরিবর্তনের সাথে সাথে জনজীবনের যে চাঞ্চল্য, যে ব্যস্ততা, ও আকস্মিক পরিবর্তনের ছবি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন তা আমাদের মনে সহজে দাগ কাটে; আমাদের মনে অনুরণন তোলে।

মায়ের পুজোয় শুধু প্রকৃতিতেই নয় 'পূজার সাজ' কবিতায় জনজীবনে সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যে ধনী ও দরিদ্র নির্বিশেষে সবার নতুন সাজে সাজিয়ে তোলার প্রচেষ্টা ধরা পড়েছে। আশ্বিনের মাঝামাঝি ঢাকের বাজনার তালে তালে দারিদ্রে জর্জরিত অভাবী সংসারের মধু, ও বিধু দুই ভাইও নেচে উঠেছে পুজোর আনন্দে। ধরা পড়েছে মানুষের মনের ভাবনায় ও ব্যবহারে হঠাৎ পরিবর্তন; বর্ষার শেষে প্রকৃতিতে পট পরিবর্তনের সাথে সাথে।

'দুই বিঘা জমি' -কবিতায় জমিদারের নিষ্ঠুরতা, 'পূজার সাজ' এ নেই। পূজা মণ্ডপ সাজাতে ব্যস্ত জমিদার রায়বাবু অবলীলায় তুলে দিয়েছেন নিজের ছেলের সাজ মধু'র হাতে সস্নেহে ও মমতায়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ 'পূজার সাজ' কবিতার শেষে জমিদারের এ উদারতাকে স্বীকৃতি দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। জমিদারের দান, দান হয়ে ওঠেনি। মধু ও বিধুর বাবা ও মায়ের আত্মসম্মান বোধ এ দানকে মেনে নিতে পারেন নি। এটা সত্যি হলেও, পুজো উপলক্ষে, জমিদারের স্বভাবের হঠাৎ পরিবর্তন - নিঠুর অত্যাচারী স্বভাব থেকে উদারতায় উত্তরণ যা 'পূজার সাজ' কবিতায় ধরা পড়েছে এটা এড়িয়ে যাওয়া যায় না; অস্বীকার করা যায় না।

'ছুটির আয়োজন' কবিতায় 'পূজার সাজ' কবিতার মতোই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কেমন করে শারদ উৎসবের পূজার ছুটির গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে প্রকৃতিতে-আকাশে আর বাতাসে। কেমন করে ছুটির আমেজে চঞ্চলতায় ছেয়েছে সবার মন। কেমন করে পুজোর ছুটির সর্বগ্রাসী প্রভাবে মেডেল পাওয়া পড়ুয়া ছাত্র হারিয়ে ফেলে একাগ্রতা। কেমন করে প্রতিটি মানুষ দৈনন্দিন জীবনের ব্যাস্ততায় ইতি টেনে নিতে চায় পুজোর ছুটির আনন্দের স্বাদ। পরিকল্পনা করে বেড়াতে যাওয়ার।

এমনি করে পুজোকে ঘিরে ছোটো বড়ো প্রতিটি পরিবর্তন ও প্রভাবের কথা রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন তাঁর সাবলীল ছন্দে 'ছুটির আয়োজন' কবিতায়। এরই পাশাপাশি পশুবলির মতো কুসংস্কারের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি 'ছুটির আয়োজন' কবিতার শেষের অংশে তুলে ধরেছেন এক অপ্রীতিকর বীভৎস মর্মস্পশী সত্যকে যা আজো আমাদের ভাবায়; মন ভরে ওঠে বিষাদে। শহরের-দাদন-দেওয়া দড়িবাঁধা ছাগল-ছানার কাছে পূজার ছুটি যে কি ভয়ংকর তা অনুভব করে আমরা শিউরে উঠি। প্রশ্ন জাগে কবে টানা হবে এ কুপ্রথার যবনিকা; কবে আমাদের চৈতন্য হবে, কবে আমরা সবাই সত্যিকার অর্থে বুঝতে শিখব মা দুর্গা জগৎ জননী।

"ভবানীপুরের তেতালা বাড়িতে
আলাপ চলছে সরু মোটা গলায়--
এবার আবুপাহাড় না মাদুরা
না ড্যাল্‌হৌসি কিম্বা পুরী
না সেই চিরকেলে চেনা লোকের দার্জিলিঙ।
আর দেখছি সামনে দিয়ে
স্টেশনে যাবার রাঙা রাস্তায়
শহরের-দাদন-দেওয়া দড়িবাঁধা ছাগল-ছানা
পাঁচটা ছটা ক'রে।
তাদের নিষ্ফল কান্নার স্বর ছড়িয়ে পড়ে
কাশের-ঝালর-দোলা শরতের শান্ত আকাশে।
কেমন ক'রে বুঝেছে তারা
এল তাদের পূজার ছুটির দিন।"

রবীন্দ্রনাথ শারদ উৎসবকে উপভোগ করেছেন সামগ্রিক ভাবে। রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, উৎসবের দিন একার আলয় সবার আলয় হয়। প্রকৃতি ও তাতে সামিল। আনন্দময়ীর আগমন ও তাঁকে ঘিরে উৎসব সর্বাঙ্গীণ হয়ে ওঠে সবার মিলনে। তাঁর গানে ও গাথায়, তাঁর সৃষ্টিতে, শারদ উৎসবের বর্ণনায় তাই এ সত্যই প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর প্রতিটি রচনায়। তা হয়ে উঠেছে এত প্রাণবন্ত -সজীব। বস্তুতঃপক্ষে তাঁর প্রতিটি শারদ উৎসবের বর্ণনাই অমূল্য। কেননা তা তাঁর সূক্ষ সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণের প্রতিফলন।

অবাক পৃথিবী

- আশা দাস

আমরা জানি সভ্যতার উষালগ্নের আবির্ভাব থেকেই মানুষ সংঘবদ্ধ ভাবে বাস করতে চেয়েছে - নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যেও, চেয়েছে এক সাথে থেকে নিজ নিজ কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে। এই কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাকল্পে বিভিন্ন সময় এসেছে বিভিন্ন রকম সংঘাত, যার হাত থেকে ধর্মও একদিন বাদ যায় নি, কিন্ত সত্যবান ন্যায়পরায়ণ ধর্মপথের কোনো দিন বিচ্যুতি ঘটে নি আর ঘটবেও না, তবু জানি এই পথ কণ্টকময়। ওই কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করতে চাই দৃঢ়তা, অধ্যবসায় ও সঠিক পথের নিশানা।

মানুষ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেছে কেন ?

সৎ চিন্তা, সৎ কর্ম, জীব সেবা ইত্যাদির দ্বারা জন্মকে স্বার্থক করার জন্য, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে এ কালের মানুষ ভোগ, আত্মসুখের জন্য সর্বদা লালায়িত। যুগের এই প্রভাবকে সনাতন ভারতের মানুষ অতিক্রম করবে কোন উপায়ে? বিশ্বের মানুষ কোন উপায়ে বিশ্বদেবতার পূজা করবে ?

এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন ক্ষণকালের জন্য। গভীর ভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে, স্বল্পায়ু এই জীবনে সত্য, সেবা, নীতি ধর্মের আর্দশ মেনে মানব জন্মকে সার্থক করার প্রয়োজন। কথায় আছে সৎ সঙ্গে স্বর্গে বাস, অসৎ সঙ্গে নরক বাস। আমরা আজ আছি কাল নেই, মৃত্যু যে কোন সময়ে আমাদের গ্রাস করবে, এমত অবস্থায় আমাদের উচিত, অপরের ক্ষতির কথা চিন্তা না করে পরনিন্দা পরচর্চা সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করে আত্ম জিজ্ঞাসায় ব্যাপৃত থেকে ভাবা উচিত, কে আমি ? কোথা থেকে এসেছি ? কোথায় যাবো ? আমার যথার্থ বন্ধু কে? মানুষের এই আত্ম জিজ্ঞাসাই মানুষ কে আধ্যাত্মিক সাধনার পথে চালিত করে। সনাতন ধর্মের মূল বক্তব্য এই আত্ম জিজ্ঞাসা।

বিজ্ঞানের গতি যত দ্রুত হোক মনের গতির কাছে তাল মেলাতে পারে কি ? না পারেনা - মন যে বাঁধন ছাড়া, তার অদমনীয় গতি, তাই মনটাকে বাঁধা দরকার। মন সংযত না হলে কোন কাজে সফলতা আসে না, শান্তি আসে না। শান্তি না এলে নিজেকে অশান্তি ভোগ করতে হয়। তেমনি অন্যকেও ভোগ করতে হয়, দেশকেও সেই অশান্তির ভাগ নিতে হয়। এই কারণে দেবতার আশীর্বাদ একান্ত প্রয়োজনীয়, তাই প্রত্যেক মানুষের দরকার সহিষ্ণুতা।

ঋষি ও মহাঋষিদের বাক্যে জানা যায় সহ্যের তুল্য পূণ্য নাই। সহ্য বা সহিষ্ণুতা ছাড়া মনে হয় জগতের কোন কাজ করা সম্ভব নয়। সহিষ্ণুতা মানুষের জীবনের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ, এই গুণ ব্যতিরেকে মানুষ জীবনে কোন বড় কাজে ব্রতী হতে পারে না।

"মানুষের চরিত্রে এইটা যেন সমুদ্র গর্ভ থেকে সংগ্রহীত বিশেষ মণি মুক্তা স্বরূপ"।

আজকের এই মহা দুর্দিনে, আত্মধর্ম, আত্মজ্ঞান বিরোহিত হবার কারণেই কিছু মানুষ পরস্পর পরস্পরকে চিনতে ভুল করে, ভেদজ্ঞানে ভরপুর হয়ে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে বিরাট ধরণের অঘটন সমাজের বুকে প্রায়শ্চ ঘটিয়ে ফেলছে। আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষে এই গুলো অত্যন্ত দুঃখজনক এবং দুর্ভাগ্য জনক ঘটনা, তাই সহিষ্ণুতা ধৈর্য্যেরই নামান্তর "তাই সর্ব জীব কে শিব জ্ঞানে" সেবার কথা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন।

গত কয়েকটি বছর আমাদের সকলের জীবনে এক অভিনব অভিজ্ঞতা হলো। সারা বিশ্ব জুড়ে দেখা দিলো এক ভয়ঙ্কর ব্যাধি "করোনা", এই ব্যাধির জন্য সারা পৃথিবী স্তব্ধ, এই অস্থির পরিস্থিতিতে বেশ কয়েক মাস কেটে গেলো। অস্থিরতার ভয়ে জীবন পালটে দিল। এমত অবস্থায় কি করবো ভাবছি, হঠাৎ মনে হলো ঘরে ঠাকুরের বই আছে, সেই সব বই পড়লে কেমন হয় ?

এই ভাবনা থেকে শ্রী শ্রী ঠাকুরের অনেক ধরণের বই নিয়ে বসে পড়লাম যা পড়ছি তাই নতুন মনে হলো "অজস্র মণি মুক্তা, হীরে, পান্না জহরত আকাশ থেকে ফেলছেন আমাদের গুরু ভগবান" আর যেন বলছেন "তুলে নাও তুলে নাও যে যতটা পারো কারণ বর্তমানে দেশের চতুর্দিকে অশান্তির আগুন জ্বলছে - সেই আগুনের অশুভ লেলিহান শিখা ভারতীয় ঐক্য শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমৃদ্ধি ও জাতীয় নিরাপত্তাকে ধ্বংসের পথে দিন দিন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ফলে সমাজের প্রতিটি মানুষের মনে দেখা দিয়েছে অশান্তি ও অস্থিরতা। মানুষে মানুষের ভালোবাসা, বিশ্বাস, আস্থা, সহানুভূতি, সহযোগিতা, পরস্পর নির্ভরতা, সমধর্মিতা, সহমর্মিতা, মানুষের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজন। অথচ তা লোপ পাচ্ছে। সমাজে দিনে দিনে দেখা দিচ্ছে মানুষে মানুষের শত্রুতা, ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ, পর নিন্দা পর চর্চা, সন্দেহ, অবিশ্বাস, অসহিষ্ণুতা, সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা ইত্যাদি। তাই ব্যক্তিগত জীবনে কি সামাজিক জীবনে কি পারিবারিক জীবনে কি রাষ্ট্রীয় জীবনে, দিন দিন দেখা যাচ্ছে একটি নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতন ও মনুষত্বের অভাব যা গোটা পৃথিবী কে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে।

এই অবস্থা থেকে মুক্ত হতে হলে মানুষ কে শোনাতে হবে ধর্মের কথা। প্রাচীন ভারতেও বিজ্ঞান ছিল, প্রযুক্তি বিদ্যা ছিল, তখন যন্ত্র শক্তির সঙ্গে ছিল মন্ত্র শক্তি তাই বৈজ্ঞানিক সাফল্যের ফল মানব মঙ্গলের কাজে প্রয়োগ করার জন্য ঋষিগণের তপস্যা সিদ্ধ উপলব্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিধান করা হতো।

বর্তমান বস্তু বিজ্ঞানের যুগে সেটা আর হয় না। তাই আজ উন্নত প্রযুক্তির ফলস্বরূপ সুষ্ঠ সম্পদ পেলেও মানুষ অসুখী, কারণ ভোগের প্রতিযোগিতায় মানুষ আজ হিংসায় উন্মত্ত। তার পরিণতিতে পৃথিবী ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত, তাই প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে না পারলে শান্তির আশা নাই।

বিশ্ব জুড়ে ভাঙা আর গড়া কত খেলাই না ঘটে গেলো এই সীমিত সময়কালের মধ্যে। পিছনে ফেলে আসা দিন গুলির কিছু স্মৃতি মলিন হতে হতে মন থেকে এক দিন মুছেও যাবে। সেই ম্লান অধ্যায়ের কিছু সোনালী স্মৃতি কিছুতেই হারিয়ে ফেলা যায় না। চির উজ্জ্বল হয়ে থাকে মনের মনিকোঠায় মন্দিরের অনির্বাণ প্রদীপ শিখার মতন। সেই আলোকের পথ ধরে আমরা এগিয়ে চলি, থেমে যাই না, চলার পথে সবই যে সুখের তা তো নয়, ক্ষনিকের তরে চলার ছন্দে শিথিলতাও আসে, কখনও পেছন দিকে ফিরে তাকাই। স্মৃতির পাতা থেকে উঠে এসে ভিড় জমায় নানান দৃশ্যপট। সেই ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ পান্নার উদ্ভাসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠি। কে যেন ভিতর থেকে বলে দেয় - এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো থেমে যেও না।

অন্যের হিত সাধন করার জন্য জীবন ধারণ করা এই ছিল আর্য সভ্যতার চরম আবিস্কার আর এই জন্যই ঋষি যুগে গড়ে উঠে ছিল আশ্রম কেন্দ্রিক সমাজ ও সভ্যতা।

মানুষ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেছে কেন ?

একাধিক শাস্ত্রকারগণ সংসারকে বৃক্ষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শাস্ত্র মতে সংসার বৃক্ষে দুইটি ফল।

এই দুইটি ফল হলো সুখ এবং দুঃখ। সংসার বৃক্ষে বাস করিয়া মানব পক্ষী এই দুইটি ফল ভোগ করিয়া থাকে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা সংসার বৃক্ষে বাস করে। এই দুই পক্ষীর মধ্যে জীবাত্মা দেহ বৃক্ষের সুখ এবং দুঃখ রূপ ফল দুটি আহার করে। পরমাত্মা কোন ফল আহার করেন না, তার কার্য্য হলো জীবাত্মার ফল আস্বাদন দর্শন করা।

আজ আমরা পৃথিবীর চার দিকে চাহিয়া দেখিতেছি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যার জয় যাত্রার সঙ্গে পৃথিবী হিংসা ধন লোলুপতা এবং ক্ষমতা লিপ্সায় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে - প্রেম, প্রীতি,ভালোবাসা যেন ধরিত্রীর বক্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পাপ প্রবৃত্তিগুলি কে আসন পাতিয়া দিচ্ছে। পীঠস্থান ভারতবর্ষ এই পাপ চক্রের বাহিরে থাকিতে পারিতেছে না। ধর্ম বিবর্জিত শিক্ষাই আজ পৃথিবীতে এই অবস্থায় টানিয়া আনিয়াছে অতএব

"দুর্যোগের গতিবেগ যতই হোক না কেন

ধর্ম কে যে আশ্রয়ে করিয়া থাকবে সে কখনই ডুববে না "

পরিশেষে বলি সমুদ্রর অনন্ত জলরাশির থেকে এক বিন্দু জল নিয়ে যা শ্রী শ্রী ঠাকুর লেখালেন আমি তাই লিখলাম। গুরু ভগবান কে জানাই অনন্ত অনন্ত প্রণাম।

রাধানাথ শিকদার

- তপন কুমার রায়

বাঙালি ছাত্রছাত্রী মাত্র প্রায় সবাই এই নামটা শুনলেই বলবে যে উনি পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা মেপে ছিলেন। ব্যাস ওই পর্যন্তই।

আমরা সাধারণ মানুষেরা রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত, ইত্যাদির ঐতিহাসিক পটভূমি নিয়ে চর্চা করলেও বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস সম্বন্ধে নির্বিকার।

রাধানাথ শিকদার সম্ভবত প্রথম ভারতীয় যিনি বিজ্ঞানকে সর্ব অর্থে নিজের জীবন ও জীবিকা করে নেন।

রাধানাথ শিকদারের জন্ম ১৮১৩ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলে শিকদার পাড়া লেনে। বাবা তিতুরাম। দুঃখের বিষয় যে আমরা কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাইনি রাধানাথের জন্ম তারিখ বা গর্ভধারিণী মায়ের নাম জানার জন্য।

রাধানাথের জন্মের কিছুদিন আগে থেকেই নবাবি আমলের একদা দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ পরিবারটির অবস্থা বেশ পড়তির দিকে। বাবা তিতুরামের ইছে হল ছেলেকে অল্প একটু ইংরিজি শিখিয়ে কোন সওদাগিরি আপিসে কেরানির কাজে ঢুকিয়ে দেওয়া। সেই মত স্থানীয় একটা স্কুলে হাতেখড়ি করিয়ে রাধানাথ আর শ্রীনাথ দুই ভাইকে ১৮২৪ সালে হিন্দু কলেজে (পরবর্তী কালে যা প্রেসিডেন্সী কলেজ নামে পরিচিত) ভর্তি করে দেওয়া হল। হিন্দু কলেজের বয়স তখন সাত। রাধানাথ প্রত্যেক বছরে এত ভাল ফল করতে লাগল যে ফার্স্ট ক্লাসে ১৬ টাকা করে জলপানি পেতে লাগলেন। তারপর বাবা তিতুরামের ছেলেকে সওদাগিরি আপিসে কেরানি করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে গেল।

১৮২৬ সালের মে মাসে হেনরি লুই ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) হিন্দু কলেজে মাত্র সতেরো বছর বয়সে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। তখন রাধানাথের বয়স তেরো। ডিরোজিও রাধানাথের জীবনে বহুলাংশে প্রভাব ফেলেন। ডিরোজিওর খোলা মনের দার্শনিক চিন্তা তখনকার যুব সমাজকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি, সে সময়কার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজ, ডিরোজিওর এই মুক্তমনা চিন্তা ভাবনাকে খোলা মনে মেনে নিতে পারে নি। ফলস্বরূপ ডিরোজিও ১৮৩১ সালে হিন্দু কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন। সেই বছরেই ডিসেম্বর মাসে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র বাইশ বছর বয়সে ডিরোজিও মারা যান। আঠারো বছরের রাধানাথের জীবনে এই ঘটনা ভীষণ প্রভাব ফেলে। রাধানাথ ডিরোজিওর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন মাত্র সাড়ে পাঁচ বছর। ডিরোজিওর যুক্তিবাদের ধরণ ও আধুনিক অর্থাৎ নিউটনিয় বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্পর্ক ওই সময় থেকেই শুরু। লিখিত পাঠ্যের বাইরে যে স্বাধীন চিন্তা করা যায় রাধানাথ সে শিক্ষাই পেয়েছিলেন ডিরোজিওর metaphysical studies এবং moral and liberal principles থেকে যা পরবর্তী সময়ে কর্মজীবনে তাঁকে প্রভূত সাহায্য করে।

ডিরোজিওর দর্শন শাস্ত্র থেকে রাধানাথের মানসিক প্রস্তুতি হলেও রাধানাথের মূল অনুসন্ধিৎসা ছিল পদার্থবিদ্যা (Physics) ও গণিত (Mathematics) বিষয়ে। এ ব্যাপারে উনি সাহায্য পেয়েছিলেন হিন্দু কলেজের দুই শিক্ষক রস এবং টাইটলার এর থেকে। টাইটলারের থেকে শুধু গণিত নয় নিউটনের প্রিন্সিপিয়াও শিখেছিলেন।

ডিরোজিওর moral and liberal principles যথার্থই রাধানাথের অন্তরে প্রবেশ করেছিল। তাই তাঁর স্নেহময়ী মা তাঁর সম্ভাব্য পত্নী হিসেবে আট বছর বয়সী একটি খুকীকে নির্বাচন করলে উনি সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেন। সারা জীবন তিনি অকৃতদার রয়ে গিয়েছিলেন।

কলেজে ছাত্র অবস্থাতেই তিনি এক বলশালী, বিশাল-দেহী তরুণে পরিণত হয়েছিলেন। শরীর চর্চার সঙ্গে উনি ডুবে যান গণিত চর্চায়, বিশেষত Spherical Trigonometryর চর্চায়। এ ছাড়া উনি ইংরেজি ও দর্শন শাস্ত্রেও প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। রাধানাথই প্রথম ভারতীয় যিনি নিউটন ও লাপ্লাস উদ্ভাবিত গণিত রপ্ত করেন এবং বিজ্ঞান, বিশেষত জ্যোতির্বিজ্ঞানে কৃতিত্ব অর্জন করেন।

তখন ভারতের ভাগ্যবিধাতা ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৭৯৯ সালে টিপু সুলতানের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দাক্ষিণাত্যে বিরাট অংশের মালিকানা পায়। তখনই ঔপনিবেশিক, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামরিক প্রয়োজনে কোম্পানির প্রয়োজন হয় ভারতের পুরো জমির গাণিতিক ও ভৌগোলিক পূর্ণাঙ্গ একটা মানচিত্র তৈরি করার। তৎকালীন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গভর্নর লন্ডনে এই প্রস্তাব পাঠান। লন্ডন থেকে সরকারী মঞ্জুরি আসে ১৮০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। প্রতিষ্ঠা হয় দ্য গ্রেট ট্রিগোনমেট্রিক্যাল সার্ভে (জি টি এস)। ওই বছরেই কর্নেল ল্যামটন এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নেন। তার কিছুদিন পরেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্যাডেট হিসাবে জর্জ এভারেস্ট (৪/৭/১৭৯০-১/১২/১৮৬৬) বেঙ্গল আর্টিলারির লেফটেন্যান্ট পদে যোগ দেন ষোল বছর বয়সে (১১ই জুলাই ১৮০৬)। ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত প্রসারিত বিস্তৃত অঞ্চলের দ্রাঘিমার একটি অংশের জরিপ ও পরিমাপ করে এই জিটিএস সংস্থা। ১৮১৭ সালে ল্যামটন এই সংস্থা সরিয়ে নিয়ে আসেন রাজধানী কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের অধীনে। তখন থেকেই ল্যামটনের সহকারী হিসেবে জর্জ এভারেস্ট সার্ভের কাজ চালিয়ে যান। এদিকে কাজের চাপ কমানোর জন্য ১৮৩১ সালের নভেম্বরে তিনি ডি পেনিং (de Penning) এর অধীনে কলকাতায় একটা নতুন কম্পিউটিং অফিস খোলেন যার ঠিকানা হয় ৩৫ পার্ক স্ট্রীট। (উল্লেক্ষ্য যে এর ঠিক আঠারো বছর পরে রাধানাথ নিজেই এই চীফ কম্পুটারের পদ অলংকৃত করেন)।

এভারেস্ট কাজ করতে গিয়ে দেখলেন পদার্থবিদ্যা আর ট্রিগোনমেট্রি, দুটো বিষয়েই ওস্তাদ কয়েকজন সহকারী ছাড়া কাজের অসুবিধে হচ্ছে। এরকম লোকের সন্ধানে এভারেস্ট শরণাপন্ন হলেন হিন্দু কলেজের। তৎক্ষণাৎ টাইটলার তাঁর ছাত্র রাধানাথকে দেখিয়ে বললেন অঙ্ক, বিশেষ করে ট্রিগোনমেট্রি জানা এরকম ছেলে তুমি এদেশে দুটি পাবে না, ইয়োরোপেও খুব বেশি পাবে না। ১৮৩১ সালের শেষাশেষি এভারেস্ট আট জন বাঙালি ছেলেকে কম্পিউটর হিসেবে নিয়োগ করলেন যাদের প্রাথমিক কাজ ছিল নিখুঁত ভাবে কম্পিউটেশান করা। শুরুতে বেতন ছিল মাসে চল্লিশ টাকা। কয়েক মাসের মধ্যেই রাধানাথ প্রমাণ করলেন যে গণিতে পটুতা অন্য সবার থেকে উচ্চাঙ্গের। এভারেস্টের উদ্যোগে তাঁকে জিটিএস-এর সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগ করা হল। এই সময়েই রাধানাথের জীবনে দ্বিতীয় পর্বের শুরু হয় ১৮৩২ সালে যখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ।

রাধানাথের ডায়েরি থেকে পাওয়া যায় – "১৮৩২ সালে আমি Great Trigonometrical Survey of India অফিসে কম্পিউটর পদে নিযুক্ত হইয়া আরও গণিত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ অভ্যাস করি। এক্ষণে (৭ই অক্টোবর, ১৮৩২) আমি সারভেয়র নিযুক্ত হইয়া Serunge Base Line এ কার্য করিবার নিমিত্ত কলিকাতা হইতে ১৫ই অক্টোবর যাত্রা করিব"।

যে আটজন রাধানাথের সঙ্গে কাজে যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে রাধানাথ ছাড়া কেউই জিটিএস-এ টিকে থাকতে পারেনি। রাধানাথই হল প্রথম উচ্চ বংশীয় নেটিভ ঐ কাজের জন্য যোগ্য বিবেচিত হল। হিন্দু কলেজের পড়াশোনা শেষ হতে তাঁর তখনও কিছু বাকি ছিল। তবু জিটিএস এর চাকরি নিতে রাজী হলেন মূলত দুটি কারণে। এক মাসটারমশায়ের নির্দেশ। দুই বাবাকে সংসারে সাহায্য করার তাগিদ।

কলকাতার ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ওপর জরীপের নতুন কোলবি বার পদ্ধতির সুত্রপাত করেন জর্জ এভারেস্ট আর এইখানেই রাধানাথের জরিপের কাজে হাতেখড়ি হয়। ১৮৩২ সালে অফিসে বসে কম্পিউটেশান প্রযুক্তির কলাকৌশল রপ্ত করেন রাধানাথ। হাতে কলমে কাজ শেখার জন্য এইবার রাধানাথকে কলকাতার বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা হল। ততদিনে জর্জ এভারেস্ট চলে গেছেন তাঁর ঘাঁটি দেরাদুন মণ্ডলে। অ্যান্ড্রু ওঅ ও রেণী টেইলরের সঙ্গে রাধানাথ গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেন। থিওডোলাইট, প্যারাম্বুলেটর (Surveyor's Wheel নামেও পরিচিত) প্রভৃতি

যন্ত্রপাতির সাহায্যে পর্যবেক্ষণের কাজ করতে করতে চুনার, অমরকন্টক, গোয়ালিয়র, আগ্রা হয়ে মুসৌরীতে হাজির হন। রাধানাথ এবার এভারেস্টের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলেন। দেরাদুনের 'বেস লাইনের' কাজ শেষ করে রাধানাথ ভূপালের সিরঞ্জ সার্ভে স্টেশনের কাজ দক্ষতার সঙ্গে শেষ করেন। এইভাবে জর্জ এভারেস্টের গ্রেট আর্কের কাজ রাধানাথের সহায়তায় শেষ হয়। এই সময়ের মধ্যে রাধানাথ এভারেস্টের কাছে জিওডেটিক সার্ভের বহু তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জিনিস শিখে নিয়েছিলেন। এভারেস্ট বলতেন শিকদারের বড় গুণ হল যে ও বইতে পড়া ফর্মুলার বাঁধাধরা প্রয়োগ ছাড়াও প্রয়োজনে পদার্থবিদ্যা ও গণিতের প্রাথমিক সুত্রের নিজস্ব প্রয়োগে একেবারে অভিনব সব পদ্ধতি উদ্ভাবন করাতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

১৮৪৩ সালে এভারেস্ট অবসর গ্রহণ করে লন্ডনে ফিরে যান। এরপর জিটিএস এর কর্তা হন অ্যান্ড্রু ওঅ।

জিটিএস এর দেরাদুন মণ্ডলে সতের বছর পার করে দেবার পর রাধানাথ কলকাতা ফেরেন জিওডেটিক সার্ভের বিশারদ হিসেভে খ্যাতি অর্জন করে। এরপর ১৮৪৯ সালে উনি কলকাতার সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার চীফ কম্পুটার পদে বসেন। ১৮৫২ সালে তাঁকে আবহবিভাগের মানমন্দিরে তত্ত্বাবধায়ক পদেও বসানো হয়। দুটি বিভাগ সামলানোর জন্য উনি তখন নিয়মিত বেতন চারশ টাকার ওপর আরও দুশ টাকা পেতেন। লক্ষ করার বিষয় যে নিজের পেশার ক্ষেত্রে তুঙ্গে ওঠার পরও ওই বেতন ছিল যৎসামান্য শ্বেতাঙ্গদের বেতনের তুলনায়।

সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তখন কর্তা ছিলেন অ্যান্ড্রু ওঅ। ওইসময় রাধানাথকে বললেন উত্তর হিমালয়ে অনেক কাজ হয়েছে। এবার পূর্ব হিমালয়ের কয়েকটা শৃঙ্গের সার্ভে করার দিকে নজর দিতে। হিমালয়ের পনেরো নম্বর চুড়াটি নিয়ে একটা নতুন সমস্যা দেখা দিল। ওই চূড়ার একদিক নেপালে আরেকদিক পড়ছে তিব্বতে। কোম্পানির কর্তারা সে সময় নেপাল আর তিব্বতের সীমানা নিয়ে নতুন কোন ঝামেলা সৃষ্টি হোক চাইছিলেন না। কাজেই স্থির হয় যে একটু দূর হলেও জরিপের কাজ ভারতীয় ভূখণ্ড থেকেই করতে হবে। ছ'টি বিভিন্ন জায়গা থেকে রিডিং নেওয়া শুরু হয়। বিভিন্ন রিডিং এর সমন্বয় করে গাণিতিক হিসেব করে ১৮৫২ সালে শিকদারের রিপোর্ট জমা পড়ার পর দেখা গেল ওই পনেরো নম্বর শৃঙ্গটির উচ্চতা হল ২৯,০০০ ফুট। অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ। কিন্তু অ্যান্ড্রু ওঅ ছিলেন অত্যন্ত হুঁশিয়ার লোক। রিপোর্ট জমা পড়ার পর উনি কোন ঘোষণা করলেন না। তলায় তলায় খোঁজ শুরু করলেন এর থেকে উচ্চতায় বেশী আর কোন পর্বত শৃঙ্গ আছে কিনা। দেখতে দেখতে চার বছর কাটিয়ে ১৮৫৬ সালে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে জিওগ্রাফিকাল সোসাইটি কে জানালেন যে তার ডিপার্টমেন্ট এই মহান আবিষ্কার করেছে। সোসাইটি অ্যান্ড্রু ওঅ-কে সাধুবাদ জানাল। এবার প্রশ্ন উঠল শৃঙ্গটির নামকরণ নিয়ে। জর্জ এভারেস্টের প্রস্তাব অনুযায়ী রয়্যাল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটি একটা সুন্দর নিয়ম চালু করেছিল যখনই কোন নতুন পাহার চুড়ার উচ্চতা নির্ণয় হবে তখন তার নামকরণ হবে স্থানীয় নামের থেকে। যেভাবে কাঞ্চনজঙ্ঘা, নন্দাদেবী, নাঙ্গা প্রভৃতি চূড়ার নাম এখনও সেই ভাবে চালু আছে। ১৫ নম্বর চূড়ারও সেই ভাবে নামকরণ করার কথা। কিন্তু বাদ সাধল এক রাজনৈতিক সমস্যা। ওই চূড়াটির স্থানীয় নাম তিব্বতিরা বলে, চোমোলাংশ বা জোমোকংকর আবার নেপালিদের ভাষায় দেওধুঙ্গা (দেবচুড়া)। ১৮৫৬ সালে ভারতে ব্রিটিশদের রাজনৈতিক অবস্থা বেশ নড়বড়ে। এই ব্যাপার নিয়ে নতুন কোন ঝামেলা ওরা নিতে চাইল না। এইসব যুক্তি সাজিয়ে অ্যান্ড্রু ওঅ রয়্যাল সোসাইটিকে লিখল এই চূড়াটির কোন স্থানীয় নাম না দিয়ে ওঁর গুরুদেব জর্জ এভারেস্টের নামে করা হোক। রয়্যাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি কিছুদিন অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত অ্যান্ড্রু ওঅ-র প্রস্তাবে মান্যতা দিয়ে ঘোষণা করে – পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গটি আবিষ্কার করেছেন কর্ণেল ওঅ তার নাম হল মাউন্ট এভারেস্ট যার উচ্চতা হল সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ২৯,০০২ ফুট উপরে। যে কাজে এভারেস্টের বিন্দুমাত্র কোন ভূমিকা ছিল না এবং যে কাজ হওয়ার দশ বছর আগে এভারেস্ট অবসর নিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন রয়্যাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি তার নিজের তৈরি নিয়ম ভেঙ্গে তার নামকরণ করল মাউন্ট এভারেস্ট, তার স্থানীয় নাম থাকা সত্বেও।

এসব কাহিনী বাদ দিলেও বলা যায় এই পনের নম্বর শৃঙ্গটির অস্তিত্ব প্রথম আবিষ্কার করেন জে ও নিকলসন আর তার পরে জন হেনেসি যারা ১৮৪৫ থেকে ১৮৫০ সালে ওই অঞ্চলে সার্ভের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু এঁরা কেউই ওই শৃঙ্গের উচ্চতা নির্ভুল ভাবে নির্ণয় করতে পারেননি। কাজেই উচ্চতম শৃঙ্গের মাপজোক করার জন্য কৃতিত্ব যদি দিতেই হয় তাহলে এই তিনজনকেই দিতে হয়। সরকারী দফতর থেকে যে রিপোর্ট দেওয়া হল তাতে কোন সারভেয়ারের নাম নেই। কেবল উল্লেখ আছে তৎকালীন চীফ কম্পিউটারের ভুমিকা যে পদটি সে সময় অলঙ্কৃত করতেন রাধানাথ শিকদার।

১৮৩১ সাল থেকে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত একত্রিশ বছর রাধানাথ একনাগাড়ে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রশাসনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে অসম্ভব শারীরিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী রাধানাথের সঙ্গে প্রশাসনের বিভিন্ন কারণে মতবিরোধ হয়। দু দুবার চাকরী থেকে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন যা ঊর্ধ্বতন কতৃপক্ষ প্রত্যাখ্যান করে।

দীর্ঘ সময় হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে থাকার জন্য রাধানাথের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু দেশে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাধানাথ স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে উঠেপড়ে লাগলেন মাতৃভাষায় শান দিতে। রাধানাথ লক্ষ করলেন যে এই দীর্ঘ সময়ে ভাষাটার আমূল পরিবর্তন হয়ে খোলনলচে পাল্টে গেছে। অনুজ বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্ত বাংলা ভাষাকে নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজিয়েছেন। ওঁদের সংস্কৃত-সিক্ত ভারী গদ্য রাধানাথের একেবারেই পছন্দ হল না। তিনি বাল্যবন্ধু প্যারিচাঁদ মিত্রকে সহজ সরল ভাষায় লেখবার জন্য প্ররোচনা দিতে লাগলেন। এর পরেই প্যারিচাঁদের 'আলালের ঘরে দুলাল' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এক কথায় বলা যায় এ এক ধরণের বিদ্রোহ, প্রয়োজনীয় বিদ্রোহ। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে দার্শনিক ও বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা ইংরাজিতেই লেখা উচিত। কিন্তু সরল বাংলায় স্ত্রী-পাঠ্য সাহিত্য লিখলেই যথেষ্ট। ওনার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাত্বিক আলোচনা যত মুখের ভাষায় আনা যাবে ততই তার শ্রী বৃদ্ধি হবে। বলতেন ওখানেই ইংরাজি ভাষার সাফল্য। রাধানাথের জীবনকালেই লাতিন ভাষা ছেড়ে ইয়োরোপে ইংরাজি, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাংলা ভাষাকে তিনি সেই মহিমায় দেখতে চেয়েছিলেন। উনি নিজের কীর্তিময় বৈজ্ঞানিক জীবন সম্বন্ধে কিছুই লিখে যান নি। সেটা লিখলে কোম্পানির আমলের প্রথম যুগে দেশীয় নেটিভদের হার্ড সায়েন্স চর্চার অনেক ইতিহাস আমরা জানতে পারতাম। স্ত্রীশিক্ষা ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে তিনি খুবই উৎসাহী ছিলেন। প্যারিচাঁদের সঙ্গে মাসিক পত্রিকা স্থাপন করে সহজ ভাষায় লিখতেন। বেথুন সোসাইটির সদস্য ছিলেন। ১৮৫৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে গঠিত 'সুহৃদ সমিতি'র অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন রাধানাথ শিকদার। কিশোরী চাঁদ মিত্র ও অক্ষয় কুমার দত্ত ছিলেন ওই সভার যুগ্ম সম্পাদক। অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে ছিলেন রাজেন্দ্র লাল মিত্র, হরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্যারিচাঁদ মিত্র, রসিক লাল মল্লিক। কালী প্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র সঙ্গে উনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এইসব বিখ্যাত মানুষদের মধ্যে কি বিষয়ে আলোচনা হত, বা দেশীয় সমাজের থেকে কি উনি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন দেরাদুন উত্তর জীবনে? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি না।

১৮৫৮ সালে চন্দননগরে গঙ্গাতীরে গোন্দলপাড়ায় একটি বাগানবাড়ি তৈরি করে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। অকৃতদার এই মানুষটি শেষ বয়সে বাচ্চাদের দঙ্গল নিয়ে খেলাধুলা নিয়ে সময় কাটাতেন। ১৮৬৪ সালে শেষবারের মত দেরাদুন যান। ১৮৭০ সালের ১৭ই মে চন্দননগরে সাতান্ন বছর বয়সে বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যপ্রেমী এই মহান ভারতীয়ের মৃত্যু হয়।

গ্রন্থ ঋণ- দ্বি-শতবর্ষে রাধানাথ শিকদার – আশীষ লাহিড়ী

যে মেয়েটি রুপালি কবিতা রেখে গেছে

- ওয়াতানাবে কাজুহিরো

শিরোকানিপে রানরান পিস্‌কান কোন্‌কানিপে রানরান পিস্‌কান

("রিমঝিম রিমঝিম চারিপাশে রুপালি কণা, রিমঝিম রিমঝিম চারিপাশে সোনালি কণা")

আইনু জাতির মধ্যে চলে আসা এক গীতিকাব্যের অংশবিশেষ এটি। আইনুরা প্রাচীনকাল থেকে দেবতা ও প্রকৃতির কাহিনি পুরুষানুক্রমে বহন করে এসেছে। তবে কাহিনিগুলো লিপিবদ্ধ করার জন্য কোনো উপায় তাদের কাছে ছিল না। তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পরের প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করার কাজ সব সময় করা হত মৌখিকভাবে।

এখন থেকে ১০০ বছর আগে আইনুর এক তরুণী নিজেকে নিয়োজিত করেছিল তার জাতির সুন্দর সুন্দর গীতিকবিতা রোমান হরফ দিয়ে রেকর্ড করার এবং সেগুলোর জাপানি অনুবাদ করে বইয়ের আকারে প্রকাশ করার কাজে।

এই মেয়েটির নাম চিরি ইউকিয়ে।

আমার এই প্রবন্ধে ইউকিয়ের জীবন ও তার কীর্তি, সেই সঙ্গে তার অনুসারীদের নেওয়া উদ্যোগের কথা লিখব।

আইনু হল জাপানের আদিবাসী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাম। এক সরকারি জরিপ অনুযায়ী বর্তমানে উত্তরাঞ্চলীয় প্রধান দ্বীপ হোক্কাইদোতে প্রায় ২৪ হাজার আইনু বংশোদ্ভূত লোক থাকেন। জাপানের অন্যান্য অঞ্চলেও কিছু সংখ্যক আইনু বসবাস করছেন।

প্রাচীনকালে সাখালিন দ্বীপ ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জসহ ওখোত্‌ক সাগরের তীরবর্তী বিশাল এলাকা জুড়ে আইনুরা বাস করলেও রাশিয়ার দক্ষিণ দিকে অগ্রসর এবং সেই গতি ঠেকাতে জাপান দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করায় আইনুদের বসবাসের ভূমি আস্তে আস্তে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। ১৯ শতকের মাঝামাঝির পর মেইজি যুগে সরকারের উদ্যোগে হোক্কাইদোতে ব্যাপকভাবে ভূমি উন্নয়ন এবং জাপানিদের বসতি স্থাপন শুরু হলে আইনু জাতির অস্তিত্ব আরও সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে।

আইনুরা পরম্পরাগতভাবে প্রধানত বন-জঙ্গলে ভালুক ও হরিণের মত প্রাণী এবং সমুদ্র-নদীতে স্যামনসহ মাছ শিকার করে জীবনযাপন করত। কিন্তু সরকারি আদেশে তাদের ঐতিহ্যবাহী জীবিকা অর্জনের উপায় ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। সেই সঙ্গে তাদের বাধ্য করা হয় তাদের নিজস্ব আইনু ভাষা ছেড়ে তার পরিবর্তে জাপানি ভাষা গ্রহণ করতে। জাপানি ও আইনু ভাষা একেবারে ভিন্ন ভাষা।

মেইজি সরকারের হোক্কাইদো উন্নয়ন নীতি গ্রহণের প্রায় ৩০ বছর পর ১৯০৩ সালে হোক্কাইদোর নোবোরিবেত্‌সু নামক জায়গায় আইনু বংশোদ্ভূত চিরি পরিবারে একটি মেয়ের জন্ম হয়। তার নাম দেওয়া হয় ইউকিয়ে। ইউকিয়ের বয়স যখন ছয়, সে আসাহিকাওয়াতে চলে যায় এবং সেখানে তার মাসিমার কাছে প্রতিপালিত হতে থাকে। মাসিমার সঙ্গে থাকতেন ইউকিয়ের দিদিমাও। আইনুদের মধ্যে পরম্পরাগতভাবে চলে আসা ইউকার নামক গীতিকবিতাগুলি খুব ভাল করে মনে রাখতেন এবং অত্যন্ত সুন্দর করে সেগুলো আওড়াতে পারতেন। ইউকিয়ে দিদিমা ও মাসিমার কাছে গীতিকাব্য এবং আইনুদের ইতিহাস সংক্রান্ত অন্যান্য গল্প-কাহিনি শুনে বড় হয়েছে। স্কুলে জাপানি ভাষায় শিক্ষা নিতে হলেও বাড়িতে দিদিমা-মাসিমা ও প্রতিবেশী আইনুদের কাছ থেকে নিজের ভাষা রপ্ত করার সুযোগ হয়েছিল তার।

ইউকিয়ের বয়স যখন ১৫, একদিন টোকিও থেকে এক ভদ্রলোক তার বাড়িতে এসেছিলেন তার দিদিমার সঙ্গে দেখা করতে। সেই ভদ্রলোক ছিলেন বিখ্যাত ভাষা বিজ্ঞানী কিন্‌দাইচি কিয়োসুকে। আইনু ভাষার গবেষক হিসাবে কিন্‌দাইচি ইউকিয়ের দিদিমার কাছে আইনু জাতির কিংবদন্তি সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন। ইউকিয়ের সঙ্গে কথা বলে কিন্‌দাইচি এই ছোট্ট মেয়ের আইনু ও জাপানি ভাষায় দক্ষতা দেখে অভিভূত হয়ে যান। তিনি ইউকিয়েকে আইনু ভাষা লিপিবদ্ধ করার জন্য রোমান হরফ ব্যবহারের উপায় বুঝিয়ে দিলেন এবং গীতিকাব্যগুলো জাপানি ভাষায় অনুবাদ করার পরামর্শ দিয়ে টোকিওতে ফিরে গেলেন। কিন্‌দাইচির কথা মত ইউকিয়ে তার দিদিমার কাছ থেকে শেখা গীতিকবিতার কয়েকটি রোমান হরফে লিখে সেগুলোর অনুবাদসহ কিন্‌দাইচির টোকিওর ঠিকানায় পাঠাতে থাকে।

ইউকিয়ের কাজ দেখে কিন্‌দাইচি একেবারে মুগ্ধ হয়ে যান এবং ইউকিয়েকে চিঠি লিখে অনুরোধ করলেন টোকিওতে এসে তাঁর কাছে অনুবাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য।

চিরি ইউকিয়ে

ইউকিয়ে স্কুলে খুব ভাল ছাত্রী ছিল। কিন্তু আইনু হওয়ার কারণে তাকে অনেকবার বৈষম্য ও হয়রানির শিকার হতে হয়। কিন্‌দাইচির মত নাম করা গবেষকের প্রশংসা ও স্বীকৃতি পেয়ে ইউকিয়ে অত্যন্ত আনন্দিত। শরীর দুর্বল হওয়ার কারণে মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনরা তার টোকিও গমনে আপত্তি করলেও সে ১৯২২ সালের মে মাসে হোক্কাইদো থেকে টোকিওতে গিয়ে কিন্‌দাইচির বাড়িতে অনুবাদের কাজ চালিয়ে যায়। এদিকে কিন্‌দাইচির পরামর্শে এক প্রকাশনা ইউকিয়ের করা গীতিকবিতার অনুবাদ বইয়ের আকারে প্রকাশ করতে আগ্রহী হয়। এইভাবে তৈরি হয় আইনু শিন্‌-ইয়োশু বা আইনু দেবতাদের গীতিকবিতা শীর্ষক চিরি ইউকিয়ের বই। এতে সংবলিত ১৩টি কবিতার প্রত্যেকটির আবৃত্তিকারক ১৩টি আইনু দেবতা। আইনুদের পুরনো বিশ্বাস, প্রাণী-অপ্রাণীসহ সবকিছুর মধ্যে ঈশ্বর বিদ্যমান। সব ধরনের পশু-পাখি ও উদ্ভিদ এবং নদী-নালা, বন-জঙ্গলের মত প্রকৃতি, এমন কি বাড়ি-ঘর, উনুন, ছুরি ইত্যাদি মানুষের হাতে তৈরি সরঞ্জাম সহ এই পৃথিবীতে যা আছে, তাদের প্রত্যেকেই দেবত্বের অধিকারী। যেমন ভালুক। ভালুকের দেবতা মানুষদের উপকার করার জন্য ভালুকের আকার ধরে এই পৃথিবীতে আসেন। মানুষ তাকে শিকার করে তার মাংস ভক্ষণ করে পেট ভরায়, তার চামড়া দিয়ে তৈরি পোশাক পরিধান করে তীব্র শীত সহ্য করতে পারে, তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে বানানো ওষুধ সেবন করে স্বাস্থ্য রক্ষা করে চলে। এভাবে ভালুক দেবতার দান ভোগ করার পর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপ পূজার আয়োজন করে ভালুক দেবতার আত্মাকে আবার পরলোকে পাঠিয়ে দেয়।

চিরি ইউকিয়ের অনুবাদ ও সংকলন করা "আইনু দেবতাদের গীতিকবিতা"-এ অন্তর্ভুক্ত ১৩টি কবিতার মধ্যে প্রথমটির বক্তা প্যাঁচা দেবতা। তার অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরছি।

শিরোকানিপে রানরান পিস্‌কান কোন্‌কানিপে রানরান পিস্‌কান
"রিমঝিম রিমঝিম চারিপাশে রুপালি কণা
রিমঝিম রিমঝিম চারিপাশে সোনালি কণা "
যাচ্ছিলাম নদীর স্রোত বরাবর ভাটির দিকে।
গাইতে গাইতে এই গান
উড়ে চলেছি গ্রামের উপর দিয়ে যেখানে মানুষের বাস
নিচের দিকে তাকিয়ে জানতে পারলাম
যারা গরিব ছিল তারা এখন হয়ে উঠেছে ধনী
আর আগে যারা ধনী ছিল তারা এখন গরিব।।
সমুদ্রতটে মানুষের শিশুরা খেলায় মত্ত
তাদের হাতে আছে খেলনার তীর-ধনুক।
"রিমঝিম রিমঝিম চারিপাশে রুপালি কণা
রিমঝিম রিমঝিম চারিপাশে সোনালি কণা"
শিশুদের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলাম
গাইতে গাইতে এই গান

তখন চিৎকার করে ওঠে শিশুদের দল
"সুন্দর পাখি! দৈব পাখি!
ছুড়ে দাও তীর ঐ পাখিটাকে লক্ষ্য করে
দৈব পাখিটাকে সবার আগে যে নামাতে পারবে
সে-ই পাবে বীর ও মহাবলশালী পুরুষের খেতাব।"।
আগে যারা গরিব ছিল এবং এখন হয়ে উঠেছে ধনী
তাদের ছেলেরা আমাকে লক্ষ্য করে
সোনার ধনুকে সোনার তীর লাগিয়ে ছুড়ে মারলেও
আমি সেগুলো আমার নিচ দিয়ে বা আমার উপর দিয়ে
উড়ে যেতে দেওয়াতে একটাও আমার গায় লাগতে পারে নি।
শিশুদের মধ্যে ছিল এক বালক যার হাতে সাদামাঠা তীর ধনুক।
তার জামাকাপড় বলে দেয় যে সে কোনো গরিব ঘরের ছেলে
তবে তার উজ্জ্বল চোখের মণি এও বুঝিয়ে দেয়
নিশ্চয়ই সে কোনো ভদ্র পরিবারের সন্তান।
একসময় সেও অন্যান্য ছেলের মত
তার সাদামাঠা ধনুকে সাদামাঠা তীর লাগিয়ে নিল আমাকে মারবে বলে।
তাই দেখে নব্য ধনী বাড়ির ছেলেরা অট্টহাসি হেসে বলে,
"কী মজা কী মজা, দেখো গরিব ছেলেটার কাণ্ড কারখানা।
ওই দৈব পাখি যেখানে নিতে চাইলেন না আমাদের সোনার তীর
তিনি কিনা নেবেন তোমার মত গরিব ছেলের পচা কাঠে তৈরি তীর"।
এই বলে তারা গরিব ছেলেটিকে পেটালো, লাথি মারল।।
কিন্তু গরিব বাড়ির ছেলেটি তাতে দমে না গিয়ে
ধনুকের ছিলায় তীর লাগিয়ে টানতে শুরু করল।
খুব বেচারা মনে হল সেই ছেলেটাকে দেখে
তাই আমি "রিমঝিম রিমঝিম চারিপাশে রুপালি কণা
রিমঝিম রিমঝিম চারিপাশে সোনালি কণা"
গানটি গাইতে গাইতে আকাশে ডানা মেলে
ধীর গতিতে ঘুরতে লাগলাম।
গরিব ছেলেটি হুট করে ছুঁড়ে দিল তীর আমাকে লক্ষ্য করে।
ছোট্ট তীরটি সুন্দর আলো ছড়িয়ে আকাশে উড়ে
সোজা চলে এলো আমার দিকে।
আমি তখন হাত বাড়িয়ে ধরে নিলাম সেটি
যাতে আমার গায় লাগে সেই তীরটি।
তার পর পাক দিতে দিতে শনশন শব্দ করতে করতে
আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এলাম।।
আমি মাটিতে পড়ে গেলে সেই গরিবের ছেলেটি
সবার আগে দৌড়ে এসে আমাকে ধরে তীর বেগে
ছুটে সোজা এসে দাঁড়াল এক কুঁড়েঘরের দরজার সামনে।
তার পর পবিত্র পুবের জানালা দিয়ে আমাকে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে
যা ঘটেছে তার কাহিনি আওড়াতে শুরু করল।
আওয়াজ শুনে ঘরের ভিতর থেকে বুড়ো-বুড়ি চলে এলো।
তাদের পরনে জীর্ণ পোশাক
তবে আমার চোখ এড়ায় নি
তাদের হাবভাবে লুকিয়ে থাকা
সম্ভ্রান্ত পরিবারের কর্তা-কর্ত্রীসুলভ আভিজাত্য।
তারা কোমর বেঁকিয়ে
ফ্যালফ্যাল চোখে আমাকে তাকিয়ে দেখে।
তার পর বুড়ো দুই হাত জোড় করে আমাকে পুজো করে বলে,
"প্যাঁচা-দেবতা, মহান দেবতা,
এই কুঁড়েঘরে আপনার আগমন
আমাদের জন্য পরম সৌভাগ্যের ঘটনা।
অতীতে বড় লোক হিসাবে গণ্য করা হলেও
কালস্রোতে ভেসে পরিণত হলাম
সামান্য গরিব পরিবারে।
আপনি এই গ্রামের রক্ষাকারী দেবতা, মহান দেবতা,
জানি, এই গরিবের বাড়িতে আপনি রাত কাটান,
সেই কামনা করাটাই অন্যায়,
কিন্তু অনুগ্রহ করে একটা রাত যদি কাটিয়ে যান আমাদের কুঁড়ে ঘরে।
কাল আমাদের যৎসামান্য সামর্থ্যের মধ্যে
কাঠের ইনাউ ফলকের নৈবেদ্য উৎসর্গ করে
যথাযথভাবে বিদায় জানাব আপনাকে।"
বলে আমার সামনে
কুড়িবার ত্রিশবার মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করল।।
এদিকে বুড়ি পুবের জানালার নিচে খড়ের রঙিন মাদুর বিছিয়ে
সেখানে আমাকে যত্ন করে শুইয়ে দিল।
তার পর বাড়ির সবাই মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সজোরে নাক ডাকিয়ে।।
আমার আত্মা যা প্যাঁচার শরীরের দুই কানের মধ্যে ততক্ষণ বসে ছিল
মধ্যরাতে উঠে দাঁড়াল। তার পর
"রিমঝিম রিমঝিম চারিপাশে রুপালি কণা
রিমঝিম রিমঝিম চারিপাশে সোনালি কণা"
গানটি গাইতে গাইতে
বাড়ির ভিতরে বাম থেকে ডানে আবার ডান থেকে বামে
সুমধুর আওয়াজ করে উড়ে বেড়ালাম।
আমি ডানা নাড়ালে আমার চারিপাশে
সুমিষ্ট আওয়াজ করে ছড়িয়ে পড়ে
সোনাদানা ধনরত্ন দৈব রত্ন।
সেইভাবে অল্প সময়ের মধ্যে এই ছোট্ট ঘরটাকে
মূল্যবান ধনরত্নে ভরিয়ে দিলাম।।
এসব কাজ শেষ হলে আমি আবার
প্যাঁচা-আকৃতির খোলসের মধ্যে ফিরে গিয়ে দুই কানের মধ্যে বসে গেলাম।
তার পর বাড়ির লোকদের স্বপ্ন দেখিয়ে জানিয়ে দিলাম
একসময় যে আইনুদের মনিব ছিল
দুর্ভাগ্যবশত সব সম্পত্তি হারিয়ে সে গরিব হওয়ার পর
নব্য ধনীদের হয়রানির শিকার হচ্ছে দেখে
আমার মায়া হোল
তাই আমি তোমাদের এখানে একরাত কাটিয়ে
দয়াপরবশ হয়ে অনেক উপহার দিয়ে গেলাম।।
রাত শেষ হয়ে ভোর হল।
বাড়ির লোকদের ঘুম ভাঙল।
বিছানার উপরে চোখ ঘষে ঘষে ঘরের ভিতরটা দেখে
তারা একেবারে থ মেরে গেল।
বুড়ো আমার কাছে এসে কুড়ি ত্রিশবার মাথা ঝুঁকিয়ে বলে,
"ঘুমের মধ্যে যেন স্বপ্ন দেখছি, তবে সত্যিকারের ঘটনা এটা।
আমাদের সামান্য কুটীরে আপনার আগমন এমনিই
আমাদের বড় আনন্দ দিত, তবে প্রভু, গ্রামের রক্ষাকর্তা, মহান দেবতা,
আপনি শুধু সেটুকু না করে আমাদের দুর্দশা দেখে

মস্ত বড় উপহার দিয়ে আমাদের ধন্য করলেন।"
বলে অশ্রুভেজা চোখে নমস্কার করল।।
তার পর বুড়ো গাছ কেটে
নৈবেদ্যর জন্য কাঠের সুন্দর ইনাউ ফলক তৈরি করে
আমাকে সাজিয়ে দিল।
তার পর আমি আগুনের দেবীর সাথে বসে
নানা দেবতার আখ্যান নিয়ে গল্প করলাম।।
এভাবে দু-এক দিন কাটতে না কাটতেই
দেব-দেবীদের প্রিয় সুরার ঘ্রাণে পুরো বাড়িটা ভরে গেল।
আমি সেই ছোট্ট ছেলেটাকে যারা আগে গরিব হলেও এখন ধনী হয়েছে তাদের কাছে
পাঠালাম এই বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ জানাতে।।
নব্য ধনীরা গরিবের বাড়িতে পৌঁছে হয়ে গেল অবাক।
তখন বাড়ির ভিতর থেকে
বাড়ির গৃহিণী বাইরে এসে
বাড়ির কর্তা উঠে এসে
কোকিলের মত মনোরম কণ্ঠে কাহিনিটি শোনাতে আরম্ভ করে,
"এভাবে এভাবে ঘটে গেল সব কিছু।
গরিব হওয়াতে আপনাদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা
আমাদের পক্ষে এত দিন সম্ভব ছিল না তবু
আমরা কোনো দোষ করিনি বলে মহান দেবতা
দয়াপরবশ হয়ে উপহার দিলেন আমাদের।
এই গ্রামে আমরা সবাই একই গোত্রের,
তাই আজ থেকে আমরা সবাই
একে অন্যের প্রতি ভাল ব্যবহার করব,
যোগাযোগ রক্ষা করব।"
কথাটি শুনে উপস্থিত সবাই বার বার হাত জোড় করে
বাড়ির কর্তার সঙ্গে অমায়িক হওয়ার প্রতিজ্ঞা করল,
সবাই একসাথে মিলেমিশে থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল।
তার পর সবাই আমার সামনে সারিবদ্ধ হয়ে বসে
আমার পুজো করলে সবার মন শান্তিতে ভরে উঠল এবং
তারা আনন্দে সুরাপানে মত্ত হল।
এদিকে আমি আগুনের দেবী, ঘরের দেবতা ও বেদির দেবীদের সঙ্গে
গল্প করতে করতে মানুষদের উৎসর্গ করা
তাপকার-এর নাচ ও রিমস-এর নৃত্য উপভোগ করলাম।

এভাবে ভোজসভাটি চলতে থাকে দু-তিন দিন ধরে।
মানুষদের সৌহার্দ্য দেখে সব চিন্তা দূর হলে
আগুনের দেবী, ঘরের দেবতা ও বেদির দেবীদের বিদায় জানিয়ে
ঘরমুখো হলাম।।
পৌঁছে দেখি, বাসাটি সুন্দর সুন্দর ইনাউ ফলক ও সুরায় ভর্তি।
তাই পাশাপাশি বসবাসকারী দেবদেবী ও দূরে বসবাসকারী দেবদেবীদের
বাসায় নেমন্তন্ন করে জমজমাট পানাহারে মেতে উঠলাম।
আমি অন্য দেবতাদের মানুষদের গ্রামে কী হয়েছে এবং কী করেছি,
তার খুঁটিনাটি শোনালে তারা সবাই খুশি হয়ে
আমার প্রশংসা করলেন।
তারা যখন চলে যান, মানুষদের উৎসর্গ করা ইনাউ ফলক
ধরিয়ে দিলাম তাদের হাতে হাতে।
... বলে এই ইতিকথা আমাদের শোনালেন প্যাঁচার দেবতা।

"আইনু দেবতাদের গীতিকবিতা" বইটি প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালের আগস্ট মাসে। কিন্তু ইউকিয়ে শেষ পর্যন্ত সেটি দেখে যেতে পারে নি। ১০২২ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর বইটির প্রুফ রিডিং যে দিন শেষ করল, সেদিন রাত সাড়ে ৮টায় হার্ট অ্যাটাকে মারা যায় চিরি ইউকিয়ে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ১৯।

একজন আইনু হিসাবে জন্ম গ্রহণ করে নানান হয়রানির শিকার হওয়ার পরও ইউকিয়ে আইনুর গর্ব কখনো ভোলে নি। আইনুদের সাংস্কৃতিক মহিমায় পরিপূর্ণ "আইনু দেবতাদের গীতিকবিতা"-র মুখবন্ধে ইউকিয়ে তার জাতির দুর্ভাগা ইতিহাস নিয়ে দুঃখ প্রকাশের পাশাপাশি তাদের গর্বময় ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখা ও সেটি ফিরে পাওয়ার আশা ব্যক্ত করেছে।

ইউকিয়ের অকাল মৃত্যুর ৮৮ বছর পর তার স্মৃতি অক্ষুণ্ন রাখতে তার ভক্ত ও অনুসারীদের উদ্যোগে নোবোরিবেত্সুতে খোলা হয় "চিরি ইউকিয়ে গিন-নো শিজুকু কিনেন্কান্" বা চিরি ইউকিয়ে রুপালি বিন্দু স্মারক যাদুঘর। ২০১৯ সালে এই যাদুঘর ইউকিয়ের লিখে যাওয়া মুখবন্ধ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের উদ্যোগ হাতে নেয়। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বহু দেশের নাগরিক স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে স্ব-স্ব ভাষায় মুখবন্ধ অনুবাদ করে পাঠিয়েছেন যাদুঘরটির কাছে। বর্তমানে ইংরেজি, চীনা, ফরাসি, হিন্দি ও ভিয়েতনামিসহ ৩০-এরও বেশি ভাষায় অনুবাদ পাওয়া যায়। আমিও মুখবন্ধটির বাংলা অনুবাদ করে পাঠিয়েছি যা সম্ভবত তাদের ওয়েবসাইটে স্থান পাবে।

চিরি ইউকিয়ের লেখা মুখবন্ধটি এরকম;

অতীতে এই বিশাল হোক্কাইদো ছিল আমাদের আইনু জাতির পূর্বপুরুষদের স্বাধীন ভুবন। অন্তহীন বিশুদ্ধ প্রকৃতির কোলে কচি শিশুর মত মনোরম ও সুখী জীবনযাপন করতেন তাঁরা। সত্যিই তাঁরা ছিলেন প্রকৃতির আদরের সন্তান। আহা, কত আনন্দে ছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষরা!

শীতকালে মাঠ ও জঙ্গল ঢেকে দেওয়া গভীর তুষারের উপর লাফাতে লাফাতে, আকাশ ও মাটি জমানো হিমের হাওয়ার তোয়াক্কা না করে ভালুক শিকারে পাহাড়ের পর পাহাড় ঘুরে বেড়াতেন তাঁরা। গ্রীষ্মকালে নীল ঢেউ থেকে ভেসে আসা স্নিগ্ধ বাতাস ও সাদা গাংচিলের সুরেলা ডাককে সঙ্গী করে সমুদ্রে গাছের পাতার মত নৌকা ভাসিয়ে সারাদিন মাছ ধরতেন, ফুলে ভরা বসন্তকালে নরম রৌদ্রে পাখিদের বিরতিহীন কিচিরমিচিরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইতে গাইতে মাঠে ভোজ্য ফুকি ও ইয়োমোগি ঘাস তুলতেন, লাল-হলুদ পাতার বাহারে সজ্জিত শরৎকালে ঘূর্ণিঝড়ে মাথা নত করা কাশফুলের মতো দেখতে সুসুকি গাছের ঝোপ ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে যেতেন, স্যামন মাছ শিকারের মশাল নিভে যাওয়ার পর রাতের অন্ধকারে সঙ্গীর খোঁজে উপত্যকা থেকে ভেসে আসা হরিণের ডাক শুনতে শুনতে পূর্ণিমার চাঁদের নিচে ঘুমের দেশে চলে যেতেন তাঁরা। আহা, কত আনন্দে, কত শান্তিতে ছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষরা!

কিন্তু হায়, সেইসব অতীত হয়ে গেছে এখন। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে বহু দশক আগে। এখানে আসে দ্রুত পরিবর্তন, ক্রমান্বয়ে পাহাড় ও মাঠ পরিণত হয় গ্রামে, গ্রামে পালটে যায় শহরে।

কবে যেন সেই প্রাচীনকালের প্রকৃতিও ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। মাঠে-পাহাড়ে আনন্দের সাথে বসবাস করতেন যেসব লোকজন, তাঁরাও কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন। তাঁদের সন্তান আমরা। কিন্তু আমরা এখন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী। কেবল বিস্মিত চোখে পৃথিবীর পরিবর্তন তাকিয়ে দেখি। অধিকন্তু আমাদের চোখে সেই আত্মার উজ্জ্বলতা আর নেই যা ধর্ম-বিশ্বাসের মাধ্যমে আমাদের পূর্বপুরুষদের আচার-আচরণ নির্ধারণ করত। দুশ্চিন্তায় পরিপূর্ণ ও অসন্তোষে জর্জরিত হয়ে আমাদের দৃষ্টিশক্তি হয়ে গেছে ম্লান। ভবিষ্যৎ আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। নির্লজ্জের মত অপরের দয়ায় নির্ভরশীল, বিলুপ্তির সম্মুখীন জাতিগোষ্ঠী... এখন এটাই আমাদের পরিচয়। অতিশয় দুঃখজনক পরিচয় আমাদের বহন করে যেতে হচ্ছে।

অতীতকালে আমাদের সুখী পূর্বপুরুষেরা কখনো কি ভেবে দেখতেন তাঁদের মাতৃভূমির এই দুর্বিষহ পরিণতির কথা?

কালের স্রোত বয়ে যায় অবিরত। পৃথিবী বদলে যায় চিরায়ত নিয়মে।

তীব্র প্রতিযোগিতায় শোচনীয় পরাজয়ের পর কাহিল অবস্থায় পড়ে থাকা সত্ত্বেও, হয়তো একদিন দু-তিনজন বলিষ্ঠ ভাই-বোনের আবির্ভাবে আমরাও নিত্য-পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে একই কদমে পা ফেলতে পারব। এমন দিন যাতে সত্যিই আসে, সেই আশায় আমরা সকাল-সন্ধ্যা অন্তর থেকে প্রার্থনা করে থাকি।

তবে...আমাদের প্রিয় পূর্বপুরুষরা দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা দিয়ে ভাবের আদান-প্রদান করতেন, সেই প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া বহু সুন্দর শব্দ, সেগুলোও কি বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য বিলুপ্তির পথে থাকা দুর্বল অন্য কিছুর মত? এরকম যদি হয়, তবে থাকবে না আমাদের দুঃখের সীমা।

আইনু হিসাবে জন্মগ্রহণ করে আইনু ভাষার মধ্যে বড় হওয়া আমি সামান্য প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছি বৃষ্টির সন্ধ্যায়, তুষারের রাতে অথবা অন্যান্য অবকাশের সময়ে আমাদের পূর্বপুরুষরা একসঙ্গে বসে যেসব গান-গল্প উপভোগ করতেন, সেই বিশাল ভাণ্ডার থেকে অল্প কিছু লিপিবদ্ধ ও জাপানিতে ভাষান্তর করার।

আমাদের কথা জানেন এমন অনেক লোক যদি এই সংকলন পড়েন, তবে সেটাই হবে আমার এবং আমার জাতিগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষদের পক্ষে পরম আনন্দ ও সুখের বিষয়।

১ মার্চ, ১৯২২

চিরি ইউকিয়ে

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী থাকে যাদের ভাষা, সংস্কৃতি বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের অস্তিত্বই বিপদের সম্মুখীন। আইনু সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য চিরি ইউকিয়ের ঐকান্তিক উদ্দীপনা আমাদের সকলের ভাগাভাগি করা উচিৎ বলে আমি মনে করি।

আইনু নৃগোষ্ঠী

প্যাঁচা (শিমা-ফুকুরো or fish owl)

বাতিঘর

- শঙ্কর বসু

তেরঙ্গা পতাকাটা পতপত করে হাওয়ায় উড়ছে-স্বাধীনতা দিবস। সকাল থেকেই শাঁখ-ঘন্টা আর বিজ্ঞাপনের শব্দে হাওয়াটা কর্কশ হয়ে উঠেছে। সোস্যালমিডিয়ায় হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে উঠে আসছে চারিদিক থেকে। লকডাউনের বাজারেও গানবাজনার ব্যবস্থা পাকা স্থানীয় ক্লাবে। সর্বত্রই একটা হ্যাপী-হ্যাপী পরিবেশ। অনেকগুলো দশক পার হওয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এখন কেবল বাঙ্গালীর ইমোশনাল পোস্ট। একটা দেশাত্মবোধ জন্মায় সুর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, বেড়ে ওঠে ভরদুপুরে আর শেষ হয় রাত ফুরোলেই-পরদিন আবার যে কে সেই।

অনিমেষের মনটা ভার হয়ে আছে। কাল রাতে আবার সেই স্বপ্নটা ফিরে এসেছিল। অস্পষ্ট আলোয় অরুণস্যারের মুখটা-কেমন যেন নরম হলুদ আলোয় চোখ বোজা ভাঙ্গাচোরা মুখটা। অনিমেষ অরুণস্যারের মৃত্যুদৃশ্য নিজের চোখে দেখেনি, কিন্তু এই স্বপ্নটা বারবার তাকে ঠুকরে গেছে। প্রায় দু-দশক হোলো মানুষটা নিভে গেছে, তবু স্বপ্নটা পিছু ছাড়ে নি। গতকালও সেই মুখ, শান্ত-চোখের দৃষ্টি পাতার আড়ালেই রয়ে গেছে, তাই ঠিক কি বলছে মানুষটা তা আবারও পড়া হয়নি। ওঃ, অরুণস্যার...।

মূল ঘটনার সূত্রপাত প্রায় চল্লিশ বছর আগে। অনিমেষের জ্যাঠামশাই একদিন তার হাত ধরে পৌঁছে দিয়েছিলেন অরুণ ভটচাজের ছোট কুঠুরী তে। আড়ম্বরহীন ঘরে একটাই তক্তপোশ, আর তার ওপরে বিরাজমান খেঁটে ধুতি পরা আধবুড়ো লোকটা-চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক রকম ধারালো। একটু হেসে অরুণস্যার বলেছিলেন-অঙ্ক করতে ভালো লাগে? অনিমেষ হ্যাঁ বা না এর মাঝামাঝি একটা ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিত করেছিলো বটে, তবে মানুষটা আর ফিরে তাকাননি। পরদিন সাত সকালে প্রবল শীতে সাইকেল নিয়ে হাজির – হাঁকডাক করে অনিমেষকে ঘুম থেকে তুলে বাইরের বসার ঘরে আলো করে বসলেন অরুণবাবু। অনিমেষের বিধবা মা বাধোবাধো হয়ে কথাটা তুললেন একবার- দাদা আপনার মাইনে টা? অট্টহাসির হিল্লোল তুলে মানুষটার উত্তর-মাইনে নিয়ে আমি পড়াই না। তবে আত্মসম্মান নিয়ে বড়ো হওয়া উচিত, তাই মাসে দশটাকা নেব। মা হেসে ফেলেছিলেন, কিন্তু অনিমেষের ব্যাপারটা খুব অভিনব লেগেছিলো- মাত্র দশটাকায় একটা মানুষ সারা মাস প্রতিদিন অঙ্ক শেখাবেন নিয়ম করে! পরে অবশ্য এটাও জেনেছিলো অরুণবাবু ওই দশটাকাটাও নিজের খরচের জন্য রাখেন না, গ্রামের যত দুস্থ ছেলেমেয়ে আছে, তাদের বইখাতা শ্লেটপেন্সিল এর খরচ সামলান ওইসব টাকা দিয়ে। তারপর তিন-চার বছর সবকটা সকাল উনি নিয়ে নিয়েছিলেন অনিমেষের থেকে। আর অনিমেষও যেন শুষে নিয়েছিলো অরুণ ভটচাজের অঙ্কের গুপ্তবিদ্যা। অনিমেষ শুনেছিলো স্যার বিয়াল্লিশ এর ভারতছাড়ো আন্দোলনে ইংরেজদের মার খেয়ে জেল খেটেছিলেন। একদিন কথায় কথায় সেই গল্প শুনিয়েছিলেন প্রিয় ছাত্রটিকে। আপনি গান্ধীজীকে দেখেছিলেন? স্মিত হেসে তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ ঠিকই। তবে ভুলে যেও না মাতঙ্গিনী হাজরা কিন্তু আমার গ্রামের মেয়ে ছিলেন। আমারই চোখের সামনে তিনি শহীদ হয়েছিলেন। বৃদ্ধ মানুষটা এই সময়ে কেমন যেন উদাস হয়ে গেছিলেন। আর বলতেন গল্প- ছোটবেলা থেকেই অনিমেষ গল্পের পোকা, তবে অরুণস্যারের মুখে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস এর অ্যাডভেঞ্চার ছিলো সবচেয়ে প্রিয়। ক্লাস নাইনে ওঠার পর অরুণবাবু অনিমেষের মা কে বললেন বউমা, এবার আমার ছুটি চাই-অনি এখন তৈরী হয়ে গেছে, আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। মার ছলোছলো চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু, সেদিকে চেয়ে উনি বলেছিলেন-আমার এখন আরো অনিমেষ তৈরী বাকী আছে যে! অনিমেষ সত্যিই তৈরী হয়েছিল, মাধ্যমিক পরীক্ষায় জেলা থেকে প্রথম হয়ে বৃত্তি নিয়ে শহরের পথে পা বাড়িয়েছিল।

অঙ্কের ব্রিলিয়েন্ট প্রফেসার অনিমেষ সেন পড়াশোনা শেষ করেছিলেন সুদূর মার্কিন মুলুকে। দেশে মাঝে মাঝে আসতেন ঠিকই, তবে গ্রামে সময় কাটানো প্রায় হতই না-আজ কলকাতা তো কাল ব্যাঙ্গালোর, এই ভাবেই সময় চলে যেত। যেদিন অরুণস্যারের অসুখের খবরটা এসেছিলো, অনিমেষ তখন দিল্লী যাবার প্রস্তুতির মধ্যে-খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার। ও ভেবেছিলো ফিরে এসে একবার দেখা করে নেবে। ফিরে এসে অবশ্য আর দেখা হয় নি, দুদিনের জ্বরই কেড়ে নিয়েছিলো মানুষটাকে। অনিমেষ একটু দুঃখ পেয়েছিল, একটু অপরাধবোধও কাজ করেছিলো, কিন্তু আর কেউ কিছু বলে নি। এমনি করেই মুছে গিয়েছিলো অরুণস্যারের লেগাসি।

পনেরোই আগস্ট ২০২১। ঘরবন্দী জীবন আস্তে আস্তে বাইরে আসার ইঙ্গিত দিচ্ছে। মুম্বাই এর ছিমছাম বাসার স্টাডিতে পায়চারি করতে করতে অনিমেষ বাইরে ঝলমলে রোদের দিকে তাকিয়ে ছিল। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সকালে ড্রয়ার ঘাঁটতে চোখে পড়েছিল পুরণো ব্রাউনপেপারে মলাট দেওয়া চটি বইটা। হাতে নিতেই সেই পরিচিত গন্ধ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আত্মকথা; শান্ত মনে প্রথম পাতাটা ওল্টাতেই চোখে পড়ে গেল আবছা কালির হাতে লেখা শব্দগুচ্ছ "মাধ্যমিকে জেলায় প্রথম কৃতি ছাত্র শ্রীমান অনিমেষ সেনকে হরিমোহন স্মৃতি পুরস্কার"-অরুণস্যারের হাতে পাওয়া সেই পুরস্কার। অনিমেষের দৃষ্টি আরো দূরে অতীতের তীরে ঢেউ তুলেছে। দূরে, অনেক দূরে সমুদ্রের কোল ঘেঁষে একাই দাঁড়িয়ে আছেন অরুণস্যার। আর সেই বাতিঘরে চোখ স্থির রেখে যেন এগিয়ে চলেছে অনিমেষের নৌকা। আরো একটু থাকুন স্যার-অস্ফুট স্বগতোক্তি অনিমেষের স্বাধীনতা দিবসের সকালকে আরো একটু উজ্জ্বল করে তোলে।

Sudeb
Joylita
Suvechha
3a Shreyansh Kar

তখন তরুণ ছিল অরুণ আলো

- রাজা মুখার্জী

বাইরে জৈষ্ঠ্যের গনগনে রোদ। রাস্তায় পিচ গলা রোদ্দুরে রাস্তাঘাট শুনশান। ঘরের সছিদ্র জানলা বন্ধ করে তার ওপর ভিজে গামছা টাঙানো। ঘরকে ঠান্ডা করার চেষ্টা। রোদের আভা লাল গামছা ভেদ করে মাটিতে আলো আঁধারির নকশা তৈরি করে। সদ্য জল দিয়ে মোছা মেঝেতে শুয়ে বাচ্চা ছেলেটা। ঘুম আসছে না। তার মা পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছে। হাত পাখা দোলাতে দোলাতে ক্লান্তির অবসাদ নিয়ে মায়ের গলা দিয়ে বেড়িয়ে আসে "পালকি চলে রে, অঙ্গ দোলে রে"। গানটা যেন মায়াবী ঘুমের জাল বিস্তার করছে ছেলেটার চোখে। ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। আর অবচেতনে চিরদিনের মত জায়গা করে নিচ্ছে গানটা। অনেকদিন পর এই গানটাই আবার সে শুনতে পাবে টেলিভিশনের পর্দায়। ধুতি আর হাতা গোটানো শার্ট পরা, ব্যাক ব্রাশ করা চুল, চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা পরা লম্বা একটা লোক চেয়ারে বসে সামনের টেবিলে হারমোনিয়াম নিয়ে গাইছে গানটা। নাম হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

আসলে আমরা যেসময় বড় হয়ে উঠেছি সে সময়টা একটু অন্যরকম ছিল। তখন লোডশেডিং হত। পরীক্ষার আগে হ্যারিকেন বা চিমনি জ্বেলে আমরা পড়তাম। গরমকালে বাবা-মা রা হাত পাখা দিয়ে হাওয়া করত। রাস্তায় আলো জ্বলত ষাট পাওয়ারের ডুম। হ্যাঁ, ল্যাম্পকে তখন আমরা ডুমই বলতাম। একটা লোক সন্ধ্যের ঠিক আগেই এসে রাস্তার ধারে কোন বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে থাকা সুইচ গুলো অন করে লাইট জ্বালিয়ে দিয়ে যেত।পুজোর পর একটা শিরশিরে হাওয়া দিত তখন। কালী পুজোর রাত্তিরে অনেকেই গায় একটা হালকা চাদর দিয়ে বের হত। হেমন্তকে বেশ অনুভব করা যেত শীত আসার আগে। সন্ধ্যেবেলা মাঠ থেকে খেলে এসে দেখতাম রেডিওতে অনুরোধের আসর চলছে। মা সন্ধ্যেবেলা গা ধুয়ে পুজো সেরে এসে বসন্ত মালতী বলে একটা ক্রীম মাখত আর রেডিওতে গান শুনত। একটা দুটো গান সেই বসন্ত মালতীর গন্ধের সাথে এমন মিশে গেছে, আজও গান দুটো শুনলেই গন্ধটা নাকে আসে। দুটোই হেমন্ত'র গাওয়া একটা "মেঘ কালো আঁধার কালো" আর একটা "সবাই চলে গেছে, শুধু একটি মাধবী তুমি এখনও তো ঠিকই ফুটে আছো।" কার লেখা কার সুর এসব তখন কিছুই জানতাম না। কিন্তু গলাটা যেন বড় মায়াবী। ভাল না লেগে থাকে না। গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সাথে এভাবেই আমার পরিচয়, মায়ের হাত ধরে। তাই তাঁর গাওয়া গান গুলোতে আমি মায়ের আদর পাই, এক ছুটে ছোটবেলায় চলে যেতে পারি।

আমরা যারা '৭১-'৭২ সালে জন্মেছি, তারা আজ যে বয়সে, আমাদের জন্মের সময় হেমন্তবাবুও সেই বয়সে ছিলেন। তার মানে উনি কোনভাবেই আমাদের প্রজন্মের শিল্পী নন। আমাদের বাবা-কাকাদের সময়ের। কিন্তু আমাদের প্রজন্মেও তিনি একরাশ মুগ্ধতা নিয়ে জেগে ছিলেন। আজও আছেন। যার অনুরোধে এই লেখাটা লিখতে বসেছি, সে-ও ওনার শেষযাত্রায় হেঁটেছিল। তখন ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপে শোক বিজ্ঞাপিত করার সুযোগ ছিল না। আমাদের শোক ছিল সারাটা দিন ধরে বুকের অনুভবের মধ্যে। তখন আজকের মত ইউটিউবে চাইলেই যেকোন সময় যেকোন গান শোনার সুযোগ ছিল না। রেকর্ড পেরিয়ে ক্যাসেটের যুগ তখন। সব গান সব ক্যাসেটে পাওয়া যেত না। অনেক গান আবার কোন ক্যাসেটেই পেতাম না। বন্ধুদের সাথে ক্যাসেট এক্সচেঞ্জ করে গান শোনা হত। টিভিতে চ্যানেল বলতে দুরদর্শন। মাঝে মাঝে পুরনো কিছু গানের রেকর্ডিং বা ইন্টারভিউ দেখানো হত। সেইটুকুতেই জাগায় দখিন হাওয়া। আজ যেন অনেক পাওয়ার মাঝে সেই একটুখানি পাওয়াটুকু হারিয়ে গেছে আমাদের।

হেমন্তবাবুর প্রথম গান রেকর্ড করা আমার বাবারও জন্মের আগে। ১৯৩৭ সালে। দুটি গান, দুটোই নরেশ ভট্টাচার্যের কথা আর শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুর। একটা "জানিতে যদি গো তুমি" আর অন্যটা "বল গো বল মোরে"। গান দুটোর কিছুটা করে শুনেছিলাম ওনার মৃত্যুর পর দূরদর্শনে সম্প্রচারিত অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সাথে এক সাক্ষাৎকারে। উনি একটু করে গেয়ে শুনিয়েছিলেন। তখন বেশ নাসিকা সর্বস্ব গলা, শহুরে পরিশীলতা তখনও আসে নি। সেসময় বাংলা গান মানে পঙ্কজ মল্লিক, কে এল সায়গল, কৃষ্ণচন্দ্র দে এইসব দিকপালদের চারণভূমি। প্রথম পাবলিক ফাংশনে গাইতেই পারেননি পঙ্কজ মল্লিক এসে যাওয়ায়। কিন্তু মনখারাপ উবে গিয়েছিল পঙ্কজবাবুকে শোনা যাবে বলে। তাঁর গায়েও 'ছোট পঙ্কজ' তকমা সাঁটা ছিল শুরুতে। ১৯৪৭ এ নিজের সুরে 'কথা কোয়ো না কো, শুধু শোনো'। তার আগে '৪১ এ প্রথম বাংলা সিনেমা "নিমাই সন্ন্যাস" আর '৪৪ এ প্রথম হিন্দি সিনেমা "ইরাদা" য় প্লেব্যাক করা হয়ে গেছে। কিছু পরে বন্ধু অমিয় বাগচীর কথা আর নিজের সুরে 'আজ কোনও কথা নয়'। সুরের চলনে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট। কিন্তু মাঝ পথে 'উধাও হয়ে যে চলে যাব দোঁহে' অংশে কেমন যেন বদলে যায় সুরটা। 'সিগনেচার' তৈরির শুরু। বিপ্লবটা শুরু হয়েছিল আরও পরে, পাঁচের দশকে। বাংলা ভাষার উচ্চারণে।পঙ্কজ মল্লিক, রাইচাঁদ বড়ালদের সাবেকিয়ানার আড়ষ্টতা ভেঙে বাংলা উচ্চারণকে আধুনিকতার রাজপথে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বাংলা গানে এটাই তাঁর মৌলিক অবদান বলে আজও অনেক সঙ্গীত বিশারদের মত। হেমন্তবাবু বাংলা গানের ভাবগাম্ভীর্যের সাথে যোগ করলেন বৈদুর্য্য কণ্ঠের শ্রুতিমাধুর্য্য।

আমার মাধ্যমিক পরীক্ষার পর রেজাল্ট বেরনোর আগে তিন মাসের অখন্ড অবসরের অনেকটাই জুড়ে ছিল বাবার পুরনো রেকর্ড, ক্যাসেট চালিয়ে গান শোনা। আর অবধারিতভাবে তার অনেকটা জুড়ে হেমন্ত। কত যে গান মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, আজও একটু শুনলেই পুরোটা বলে দিতে পারি। '৫২ সালে 'আনন্দমঠ' সিনেমায় লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে গাওয়ানো "বন্দে মাতরম"। চমকে উঠেছিলাম শুনে! তার আগে এই গানের একটাই সুর শুনেছিলাম। সেটা রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। সকাল বেলা ৬টার সময় রেডিওর অনুষ্ঠান শুরুর সময় বাজত। সুরের উৎকর্ষ বুঝি না, কিন্ত বেশ মন্থর লয়ে গাওয়া। হেমন্তবাবুর সুর যেন আগুন জ্বেলে দেওয়া। সর্বভারতীয় সঙ্গীত জগতে সেটাই প্রথম সুরকার হেমন্তের আত্মঘোষনা। এর পরেই এল 'নাগিন'। সারা ভারতে এখনও বিয়ের ব্যান্ডপার্টি, আপনি চান বা না চান, বাজাবেই হেমন্ত সুরারোপিত 'নাগিন মেরা মন দোলে রে' আর হ্যারিসন রোড পাড়ায় মেহবুবা ব্যান্ডে 'নিঝুম সন্ধ্যায় ক্লান্ত পাখীরা' তা সে ঠাকুর বিসর্জনই হোক আর শিবরাত্রিই হোক, নেমন্তন্নে শুক্তোর মতো পাতে পড়বেই। এর পর পুরো ষাটের দশক জুড়ে উত্তর কলকাতার ঘুপচি রান্না ঘরে মুসুর ডালে ফোরন দিয়ে কিংবা সরকারি আপিসের কনিষ্ঠতম কেরাণী শ্রাবণের ঘনপুঞ্জ মেঘের দিকে তাকিয়ে যা ভেবেছে তা-ও হেমন্ত - "এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন"।

সে সময় বাঙালির কি গায়ক ছিল না? অন্যদের কথা যদি ছেড়েও দিই, প্রায় সহযাত্রী মান্না দে ও কিশোর কুমারের কথা কি আমাদের মনে পড়বে না? নিঃসন্দেহে তাঁরা প্রতিভাবান। জনপ্রিয়তাতেও আকাশছোঁয়া। তবু হেমন্ত নির্বিকল্প ও অনন্য। রাগের উত্থানপতন, কালোয়াতি ওসব পন্ডিতদের জন্য, হেমন্ত'র গান শুনলে মনে হয় "অনেক দিনের পরে যেন বৃষ্টি এল"। কত সিনেমা শুধু ওই হিরন্ময় কণ্ঠকে সম্বল করে দুর্গম পথে পাড়ি দিয়েছে। মরুতীর্থ হিংলাজ আদ্যান্ত ধর্মীয় কাহিনী, হেমন্তর "পথের ক্লান্তি ভুলে" শুনলে মনে হয় ওই মরুভূমিতেও কোথাও দোয়েল, বাবুই ধারা জলে স্নান করছে। মনে আছে, "শেষ পর্যন্ত "প্রথম যখন দেখি বেশ একঘেয়ে লেগেছিল। তবু উঠে যেতে পারি নি তার কারণ ওই হেমন্ত। যে ভুলের বালুচর মনে বাসা বেঁধেছে সে আর এ জন্মে যাবার নয়।

১৯৪৭ সাল, আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার বছরে, প্রচলিত দেশাত্মবোধের রমরমার মধ্যে তিনি গেয়ে উঠলেন 'কোনও এক গাঁয়ের বধূর কথা তোমায় শোনাই শোনো'। পঞ্চাশের মন্বন্তরের এই নাড়ি ছেঁড়া ধন ৭৮ আরপিএমের দুটো চাকতিতে ঢুকে এক লহমায় পৌঁছে গেল বাঙালীর অন্দরমহলে। সলিল চৌধুরীর হাত ধরে একের পর এক গানে নতুন করে সময়ের সংজ্ঞা নিরূপণ করছেন। অবাক পৃথিবী, পাক্কীর গান বিনোদনের গন্ডী ভেঙে বঞ্চনার ইতিহাসকে আমাদের বোধে প্রথিত করেছে।

১৯৫৫ তে "শাপমোচন "। উত্তম- সুচিত্রার রোম্যান্টিক সম্পর্কের অছিলায় এই যে সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ সমাজ উত্তর ঔপনিবেশিক নগর সভ্যতার প্রণয় কটাক্ষে সাড়া দিল, অহল্যার শাপমোচনের মত, হেমন্ত কণ্ঠ সেই ঝড়ের আভাস দেয়। ইঁটের পাঁজরে লোহার খাঁচার মর্মব্যাথা আমাদের জানিয়ে দেয় সময় বদলাচ্ছে। ঝড় সেই সমাজ বদলের রূপক। এক সঙ্গীত বিশারদের কাছেই শুনেছিলাম হেমন্ত মুখোপাধ্যায় উত্তম-সুচিত্রার ছবিতে যেভাবে গাইতেন তার ভাবার্থ আমরা দেখতে পাই 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' চলচ্চিত্রে রাজসভায় গুপির গানে। শাস্ত্রীয় নিয়মকানুনের বাইরেও বাংলা গান হয়ে ওঠে প্রাণের উচ্চারণ। অথচ, এই শাস্ত্রীয় কাঠিন্য যে তিনি অবলীলায় পার হয়ে যেতে পারেন তার দৃষ্টান্ত তো 'রানার', যা রূপকথাকেও হার মানায়। এই হতভাগ্য ডাকহরকরার যাত্রাপথে শুধু 'সা'

থেকে শুরু করে ছ'বার ষড়জ পরিবর্তন আছে। অর্থাৎ 'সা' বদলে যাচ্ছে, থামছে না রুট কর্ডে। মেজর কর্ড-এর দিগন্ত থেকে মাইনর কর্ড-এর দিগন্ত জুড়ে সলিল একটা ছবি ফুটিয়ে তুলতে চান, টোনের অদলবদল করেন, না হলে পুঁজিবাদী ব্যবসার ক্লান্তি 'পিঠেতে টাকার বোঝা তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া' ধরা পড়বে না। হেমন্ত কী অনায়াসে এই দুরূহ ব্রত সম্পাদন করলেন! হেমন্ত ছাড়া 'রানার' গাওয়া সম্ভব?

রবীন্দ্রনাথ, যিনি না থাকলে, বাঙালী কোনদিন সাবালক হতে পারত কি না সন্দেহ, তাঁর সাথেও বাঙালীর সম্ভ্রমের দুরত্ব ঘুচেছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরেই। আশ্রমিক আভিজাত্য ছেড়ে মধ্যবিত্তের গ্রামোফোন রেকর্ড আর পাড়ার জলসায় হেমন্ত কণ্ঠই গেয়ে শোনাল "শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু, হে প্রিয়"। বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের অন্তিম যাত্রার ধারাবিবরণী রেডিওতে সম্প্রচারিত হয়েছিল। সঙ্গে ছিল হেমন্ত কণ্ঠে "যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন"। এমনি দরদী কণ্ঠে অমন গান বাঙালীকে কাঁদিয়ে ছেড়েছিল সেদিন। '৫০ বা '৬০ এর দশকের গোড়ার দিকে বাঙালী রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতেই চাইত না। শুনেছি অনুরোধের আসরে রবীন্দ্রনাথের গান শুরু হলে রেডিও বন্ধ করে দিত। সেই বাঙালীর শোয়ার ঘরে রবীন্দ্রগানকে পৌঁছে দিলেন যাঁরা তাঁদের একজন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আর অন্য তিনজন হলেন দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪৮ এ "প্রিয় বান্ধবী" প্রথম প্লেব্যাকে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়া। তারপর ১৯৫২ তে লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে প্রথমবার গাওয়ালেন রবীন্দ্রনাথের গান- ডুয়েট। একটি "তোমার হল শুরু আমার হল সারা" আর অন্যটা "মধু গন্ধে ভরা"। যন্ত্রানুসঙ্গ পরিচালনায় ছিলেন ভি. বালসারা। ঘটনাচক্রে এবছর তাঁর জন্মশতবর্ষ। ১৯৬১ তে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে সুচিত্রা, কণিকাকে সাথে নিয়ে একের পর এক গীতিনাট্য রেকর্ড করা। হেমন্ত না থাকলে শ্যামা, শাপমোচন কিংবা চন্ডালিকা, বাল্মিকী প্রতিভার অমন কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ বাহু বিস্তার সম্ভব হত না। আমরা বাঙালী বলেই জানি, ভেড়ির নোনা জলও হেমন্ত পান করলে মিষ্টি হয়ে যেত। চলে যাওয়ার ন'বছর আগে দাদার কীর্তি সিনেমায় গাইলেন "চরণ ধরিতে দিও গো আমারে"। যিনি অবাঙমনসগোচর, তাঁর প্রতি অমন নির্মল আত্মনিবেদনে চিত্তশুদ্ধি হয়। গায়কের এই একক অঞ্জলি শ্রোতাকে নিয়ে চলে যায় সিনেমা হল ছাড়িয়ে আত্ম অনুভূতির রাজ্যে। মন হয়ে যায় শান্ত সমাহিত।

গুলজার এক স্মৃতিচারনায় বলেছিলেন বলিউডে একাধারে গান গাইছেন, সুর করছেন, সিনেমা প্রোডিউস করছেন, ষাটের দশকে এমন কলার তোলা বাঙালী দেখা যেত না। মার্সিডিজ চালিয়ে হাতে ট্রিপিল ফাইভের সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে গোটা বলিউডে সেসময় রাজ করেছেন হেমন্ত। বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক সি রামচন্দ্র এক বার প্রশ্ন করেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে, "আপনি তো গায়ক, সুরকার, প্রযোজক— তিন রকম ভূমিকাই পালন করেছেন। এর মধ্যে আপনার নিজের সবচেয়ে ভাল লাগে কোনটি?" হেমন্তর উত্তর ছিল, "অবশ্যই গায়ক।" সুরকার হিসেবে নিজের মূল্যায়নে খানিকটা উদাসীন ছিলেন তিনি নিজেই। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুর-রচনা সম্পর্কে বাঁধা গতের কিছু কথা শুনতে আমরা অভ্যস্ত— খুব সহজ সরল সুর করতেন, বেশি খাটতে হত না, ইত্যাদি। একটু মনে করে দেখা যেতে পারে, কোন পরিস্থিতিতে কী ধরনের সুর তিনি করেছেন, কাকে দিয়ে কী গান গাইয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের "দিনের শেষে ঘুমের দেশে" গানটা পঙ্কজ মল্লিক প্রথম ব্যাবহার করেন 'মুক্তি' ছবিতে। '৭২ সালে ' অনিন্দিতা ' ছবিতে হেমন্তবাবু নিলেন দুটো স্তবক বেশী। রেকর্ডে দু-পিঠে গানটা ছিল। দুপিঠেই সুরকার হিসেবে পঙ্কজবাবুর নাম। কিন্তু একটু ভাল করে শুনলে কেমন সন্দেহ হয়। বর্ধিত অংশেরও কি সুরকার তিনি? এর পরের কথাটা হেমন্ত'র কাছেই শোনা যাক। "অনিন্দিতা-র গান করার সময়ই মনে হয়েছিল, পঙ্কজদার সুরটা রাখব। তাই পরিবর্ধিত অংশটি নিয়ে ওঁকে শুনিয়ে সম্মতি চাইলাম। খুশি হয়েই অনুমোদন দিলেন। পুরো গানটারই সুরকার হিসেবে ওঁর নাম রাখলাম। তার দুটো কারণ। ওঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা। আর দুই, এতে ছবির অন্যতম সুরকার হিসেবে পঙ্কজদার কিছু অর্থপ্রাপ্তি হবে!" রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন যখন মনে হত সাধক হেমন্ত। অথচ এই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কেই কী অদ্ভুতভাবে সমালোচনার মুখে পড়তে হল রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি রেকর্ড বেরনোর পর। যার এক পিঠে 'যখন ভাঙল মিলনমেলা', অন্য পিঠে 'আমার এ পথ'। ট্রেনার ছিলেন প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ অনাদি দস্তিদার। প্রথম গানটিতে সঞ্চারীতে এসে উনি গাইলেন, 'ভেবেছিলেম ভুলব না আর আমার চোখের জল'। গাইছিলেন 'গীতমালিকা' দেখে। সেখানে কথায়, স্বরলিপি-তে অমনই লেখা ছিল। অথচ শেষে শুদ্ধিপত্রে লেখা ছিল, 'ভুলব না' নয়, হবে 'ঝরবে না'। কারও খেয়াল হয়নি। সে ভাবেই রেকর্ড বেরিয়ে গেল। ব্যস, পুরো দায় তখন যেন একা হেমন্তর। অজস্র বাক্যবাণে বিদ্ধ হতে হল আজীবন মিতভাষী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে।

মনে আছে প্রথম যখন উত্তম-সুচিত্রার "হারানো সুর" দেখি, দুর্গা পুজোর নবমী। মাধ্যমিক পাশ করার পর সদ্য কোথাও যেন একটু অন্যরকম অনুভূতি মনের মধ্যে। তারপর যখন শুনলাম "তুমি যে আমার" আর "আজ দুজনার দুটি পথ" সারা রাত ঘুম আসে নি। সুরকার- হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। অসম্ভব ভাল বুঝতেন মানুষের মনের অনুভূতিগুলো। তাই অনেক গান যা আপাত দৃষ্টিতে বৈচিত্রহীন তা-ই ওনার সুরে হিট। 'নাগিন' ছবিতে হারমোনিয়াম আর ক্লাভিয়োলিন ব্যাবহার করে সাপুরের বীণের আওয়াজে সারা ভারত মেতে উঠেছিল। কিশোর কুমার "লুকোচুরির" সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিজে না নিয়ে তুলে দিয়েছিলেন 'হেমন্তদা'র হাতে। আমরা পেয়েছিলাম "মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে"। বিবিসির সমীক্ষায় যা পঞ্চাশ বছরের সেরা গানের একটি। এই সিনেমারই আরেকটি গান "শিং নেই তবু নাম তার সিংহ"। শুনে চমকে উঠেছিলাম। " এই তো হেথায় কুঞ্জছায়ায়" আর এই গান, একই ছবিতে একই সময় একই লোকের সুর করা! কিশোরকে দিয়ে প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ানোও এই ছবিতেই "মায়াবন বিহারিণী হরিণী"। সত্যজিতের চারুলতায় এর পরে গাওয়া। তাঁর প্রযোজনায় ও সুরে সমৃদ্ধ 'নীল আকাশের নীচে' দেখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু বলে ওঠেন, "You have done a great service to the nation"; আবার বিদেশি পরিচালক কনরাড রুক্স-এর ছবি 'সিদ্ধার্থ'-এ সঙ্গীত পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি গেয়ে আসেন সেই 'নীল আকাশের নীচে'র প্রাণমাতানো গান, 'ও নদী রে'। ওয়েস্ট ইন্ডিজে তাঁকে স্পর্শ করে প্রবাসী ভারতীয়রা বলে ওঠেন, "ইন্ডিয়াকে টাচ করছি।"

প্রতিভার হীরকদীপ্তি যেমন শিল্পীর চতুষ্পার্শে এক মোহময়তার সৃষ্টি করে, তেমনই ব্যাক্তি মানুষকে করে তোলে এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসী। ৫০-৬০ এর দশকে গায়ক, নায়ক অনেকেই মানুষের সহজ নাগালের বাইরে থেকে নিজেদের স্টারডমকে উপভোগ করতেন আর একই সাথে সযত্নে লালন করতেন এই বিচ্ছিন্নতাকে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এখানে এক উজ্জ্বল ব্যাতিক্রম। গায়ক, সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক, প্রযোজক সব কিছুর পরেও 'মানুষ' হেমন্তকে ছাড়া কোন নিবন্ধই সম্পূর্ণ হয় না। অমন উচ্চতার ধুতি আর হাতা গোটানো শার্টের নিপাট ভদ্রলোক আর অমন মরমী মনের মানুষ মৃত্যুর তেত্রিশ বছর পরেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রতিমাসে বেশ কিছু পরিবারের কাছে পৌঁছে যেত নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকার খাম। আর এ নিয়ে বাইরে আলোচনা তো দূরে থাক এমন কি ওনার স্ত্রী, বেলা দেবীও জানতেন না। জানতেন একমাত্র ওনার সর্বক্ষণের সঙ্গী সেক্রেটারি ও গাড়ির চালক 'সনৎ' বাবু। সনৎ, সনৎ কোথায়?... খামগুলো ঠিকমতো পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে তো?" ১৯৮৯ এর ২৬ সেপ্টেম্বর। মধ্য কলকাতার নার্সিংহোমে শুয়ে শেষ বিদায়ের কয়েক ঘণ্টা আগে বলেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। নিশ্চিত জানেন, হাতে আর সময় বেশি নেই। তবু তার মধ্যেই খোঁজ নিচ্ছেন, প্রতি মাসের পয়লা তারিখে খামে করে আঠেরো-উনিশজনকে যে অর্থসাহায্য তিনি পাঠান, তার কী হল? চল্লিশ বছর ধরে এটাই তো নিয়ম। শেষ সময়েও তার যেন অন্যথা না হয়। মানুষ হেমন্ত'র এমন স্মৃতি আজও অনেকের মনেই অমলিন হয়ে আছে। এসব ঘটনার কথা কোনদিন তার মুখ থেকে কেউ জানতেও পারে নি। এই প্রচার বিমুখতাই কোথাও গিয়ে মানুষ হেমন্তর দীর্ঘ ললাটে অমরত্বের রাজতিলক এঁকে দেয়।

শতবর্ষ পার করে আগামীর আলোকবর্ষে দ্বার খুলে দাঁড়িয়েছে এক বিস্ময়। পায়ে পায়ে পৌঁছে যেতে হবে আরও অনেক দূরে অনন্ত নক্ষত্রবীথিতলে। গান গুলো আজ রাজা বসন্ত রায় রোডের বাড়ির নিচে এসে সার দিয়ে দাঁড়ায় শতবর্ষের সুর নিয়ে। যে সুরে বাতাসে মধু ঝরে, যে সুরে সিন্ধু জলে মধু ক্ষরণ হয়, যে সুরে পৃথিবীর ধূলিকণা মধুময় হয়ে ওঠে। উল্টোদিকের কৃষ্ণচূড়া গাছ থেকে লাল ফুল ঝড়ে পরে শ্রদ্ধা আর ভালবাসায়। ল্যাম্পপোস্টের নিচে যে ঝাল মুড়ি বিক্রেতা ভরত পাল বসে, যার থেকে তিন তলার ফ্ল্যাটে মশলা মুড়ি যেত, লতা বা কিশোর এলে সে-ও আজ পায়ে পায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। চায়ের দোকানের তারাপদ দে, যাকে জামা কিনে দিয়েছিলেন নিজের মাপের, আর তার পর নতুন শার্ট বড় হয়েছে দেখে খুব লজ্জা পেয়ে আবার মাপ নিয়ে নতুন জামা নিয়ে এসেছিলেন, সেও আজ দোকান ফেলে চলে এসেছে। সকলের চোখেই আজ ঘোর লেগেছে। এক জন গায়ক যিনি সবিনয়ে মৃত্যুর দু'বছর আগে 'পদ্মভূষণ' উপাধি নিতে অস্বীকৃত হন, এক জন গায়ক যিনি হলিউডে প্লেব্যাক করেছেন, এক জন গায়ক যাকে বিশ্বভারতী সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেছে, ধুতি আর শার্টের অমন সুদর্শন, অনুপম কণ্ঠের পুরুষ ছাড়া কে আর আমাদের শাসন করতে পারত স্বাধীনতার পর তিনটি দশক জুড়ে? একদা আমাদের সংস্কৃতিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রাজত্ব করতেন বলেই তাঁর জন্ম শতবর্ষ পার করে,ভগ্ন স্বাস্থ্য, হৃত স্বপ্ন, আমাদের মতো নির্জীব উত্তর প্রজন্মের মনে হয় বাঙালি হয়ে ওঠা কত বড় স্বর্গাভিযান!

আদর্শ মা

- চন্দ্রিমা কুণ্ডু

অনেক দিন আগের কথা. তখন আমি ক্লাস সেভেন। শিক্ষিকাদের কাছে বকুনি খাওয়া খুব স্বাভাবিক একটা বিষয়। তবু কেন জানি না আজ ও পরিষ্কার মনে আছে বকুনির সবকটা শব্দ।

শুরুতে বলে রাখি আমি ছিলাম রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা স্কুল এর ছাত্রী। আমাদের স্কুল ছিল আংশিক আবাসিক। অনেকে হয়ত জানেন রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলএর শিক্ষক শিক্ষিকারা অনেকে আমাদের মতন সংসারী ঘর থেকে আসেন আবার অনেকে সন্ন্যাস নেওয়া, যারা থাকেন স্কুল প্রাঙ্গন এর মধ্যে আবাসনে। সন্ন্যাস জীবনের অনেক নিয়মকানুন আচার আচরণ সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলাম স্কুল এর শিক্ষিকাদের কাছেই। সাধারণ সংসার জীবন ত্যাগ করেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। তার জন্য লাগে অনেক সাধনা। বিষয়টা খুব সহজ নয়। সংসার ছাড়ার পর প্রথম বারো বছর পালন করতে হয় ব্রহ্মচর্য। সেই সময় দেখেছি শিক্ষিকাদের বসন ছিল লাল পার সাদা শাড়ি। তখনও মাথার চুল কাটা হত না. সেই সময় পার হলে আরো অনেক পরীক্ষাপর্ব কাটিয়ে তারা হতেন দ্বিজ মানে শুরু করতেন দ্বিতীয় জন্ম, সন্ন্যাস জীবন। তখন তাদের নামেরও পরিবর্তন হত।

এবার আসা যাক আমার আসল গল্পে। সময়টা শীত আর গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। চলছিল বিজ্ঞানের ক্লাস। শিক্ষিকাদের নামের সাথে দিদি যোগ করে ডাকতাম আমরা। বিজ্ঞানের শিক্ষিকা ছিলেন অমিতাদি। তখন তিনি পালন করছেন তাঁর ব্রহ্মচর্য জীবন। বেশ সুন্দর দেখতে ছিলেন। খুব লম্বা ছিলেন না কিন্তু চুলের দৈর্ঘ্য ছিল দেখার মত। কালো ঘন লম্বা চুল হাটুর নিচে পর্যন্ত যেত। যদিও একটা আলতো হাত খোপা ছিল একমাত্র চুলের সাজ। পরনে লাল পার সাদা শাড়ি। আমাদের বয়স তখন বারো কি তের। ওই বয়সেও ওনাকে দেখে আমাদের বেশ কষ্ট হত। বন্ধুরা বলাবলি করতাম এত সুন্দর চুল ব্রহ্মচর্য সময় শেষ হলেই তো কেটে ফেলতে হবে। কিভাবে পারবেন? স্বাভাবিক ভাবেই চুলের প্রতি একটা আলাদা আকর্ষণ থাকে সব মেয়েদের। ওঁরা অসাধারণ এই ছিল আমদের সকলের ধারণা।

বারবার চলে যাচ্ছি অন্য কথায়। আসলে সন্ন্যাস জীবন সম্পর্কে একটু না বললে কেমন যেন গল্পটা বোঝা যাবে না এইরকম মনে হচ্ছে। যেটা বলছিলাম, বিজ্ঞানের ক্লাস চলছে। খুব ভালো শিক্ষিকা ছিলেন আমাদের অমিতাদি। শিক্ষিকাদের সকলেরই মান অবশ্য খুব ভালো ছিল আমাদের স্কুল এর। মন দিয়ে পড়া শুনছি, হঠাৎ একটি মেয়ে উঠে বলল, "দিদি আমার বেশ ঠান্ডা লাগছে, পাখাটা বন্ধ করে দিতে পারি?" উনি হাঁ বলে পরানো জারি রাখলেন। আমি বসেছিলাম ঠিক ওই মেয়েটির কাছে একটি জায়গাতে। আমার একটু গরম গরম লাগছিল পাখা বন্ধ হতে। অথচ পাশের রো এর উপরের পাখা চলছিল আর একটি জায়গাও খালি ছিল। অমিতাদিকে বিরক্ত না করে আমি খুব আসতে পাশের রোএর খালি জায়গাতে চলে গেলাম আমার বই নিয়ে। ব্যাস, কিছু বোঝার আগেই প্রচন্ড রেগে গেলেন। বুঝতেই পারলাম আমার জায়গা বদলের জন্য। প্রথমে ভাবলাম ওনাকে জিজ্ঞাসা না করে স্থান পরিবর্তন এই রাগের কারণ। তাই বললাম, "দিদি আপনাকে পড়ানোর সময় বিরক্ত করবনা বলেই জিজ্ঞাসা করি নি। আমার গরম লাগছিল আর পাশের রো এর পাখার নীচে জায়গা খালি ছিল, তাই....." উনি আরো রেগে গিয়ে বললেন, "এইটুকু গরম সহ্য করতে পারলে না, জীবনে কোনদিন আদর্শ মা হতে পারবে না।" কান মাথা পুরো গরম আমার। গোটা ক্লাসের মাঝে দাঁড় করিয়ে এ কি অপমান! যাইহোক ক্লাসের বাকি সময়টা শেষ করে দিদি বেরিয়ে গেলেন। বকুনির পরবর্তী সময়ের পড়া অবশ্যই আমার কানে ঢোকে নি। আধুনিক টিভি সিরিয়াল এর চমকপ্রদ ঘটনার পর একই বাক্য যেভাবে ইকো করে বারবার শোনানো হয় আমার কানেও তখন বেজে চলেছে " তুমি কোনদিন আদর্শ মা হতে পারবে না!" এই বাক্য। দিদি ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে যেতেই বন্ধুরা চলে এল আমাকে সান্তনা দিতে। আমি কিন্তু খুব সহজে শান্ত হতে পারিনি। আমার মনে হয় নি আমি খুব বড় কোনো অপরাধ করেছি। তাই বারবার মনে হয়েছে এটা অমিতাদির দোষ। বিনা কারণে এত কটু কথা বলে আমাকে বকলেন। বারো তের বছর বয়সে আমি 'আদর্শ' মা কি জিনিস সেই সব কিছু না জেনে বুঝেই মনের রাগ থেকে বন্ধুদের সামনে বলে উঠেছিলাম, "আমি তো তবু আদর্শ মা হতে পারব না আর উনি তো সন্ন্যাসী হবেন, তাই কোনদিন মা হতেই তো পারবেন না। আদর্শ তো পরের কথা।" পরে বড় হয়ে যতবার ভেবেছি তখন খুব খারাপ লেগেছে। সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশ কোনো সহজ জিনিস নয়। সাধারণ মানুষ পারে না বলেই তাঁরা অসাধারণ। সন্ন্যাসিনী শিক্ষিকাদের সাথে থেকে পরে আরো অনেক জেনেছি, দেখেছি কি সংযম কি ত্যাগের মধ্যে দিয়ে তাদের যেতে হয়। রাগের মাথায় কি সব বলে বসেছি বন্ধুদের কাছে। ভেবেছিলাম যেদিন স্কুল পাশ করে বেরোব সব শিক্ষিকাদের প্রনাম করব কিন্তু অমিতাদিকে নয়। বাস্তবে যদিও সেটা হয়নি। ততদিনে আমার রাগ পরে গেছিল। অমিতাদিও তাঁর ব্রহ্মচর্য জীবন শেষ করে সন্ন্যাসিনী হয়েছেন। তখন তাঁর নাম প্রব্রাজিকা অসীমপ্রাণা মাতাজী। পরনে সন্ন্যাসের বেশ, মাথার ঘন লম্বা চুলও শেষ।

মাঝখানে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। আজ আমি মধ্যবয়স্কা মহিলা, দুই সন্তানের মা। তবে 'আদর্শ মা' হতে পেরেছি কি না জানি না। জীবনে এতটা সময় পেরোলাম, অগনিত মা এর সাথে পরিচিত হলাম। আদর্শ শব্দের বিপরীত যদি আদর্শহীন হয় তাহলে সত্যি বলছি এখনো পর্যন্ত একটাও আদর্শহীন, সহ্যশক্তিহীন মা এর সাথে পরিচিত হলাম না। আদর্শ মা এর প্রয়োজনীয় গুনাবলীর তালিকা ও কথাও চোখে পরেনি। এত কোর্স, এত ডিগ্রী আছে দেশে বিদেশে কিন্তু আদর্শ মা হবার কোর্স তো কোথাও দেখলাম না। বাস্তবে কি তাহলে আদর্শ মা বলে কিছু হয় না? না কি সব সন্তানের কাছে তার জন্মদাতা মা'ই 'আদর্শ মা', সে যেমনই হোক না কেন।

ক্ষুদ্‌দা এবং ওল্ডএজ হোমের দুশ্চিন্তা

- অনুপম গুপ্ত

এই কিছুদিন আগে ক্ষুদ্‌দা ও রমলা বৌদি জাপানে গিয়েছিলেন। অনেক বারই গিয়েছেন, নতুন কিছু নয়। কিন্তু ওখানকার লোকের ব্যবহার সত্যিই মনে রাখার মত। সারা পৃথিবীর অন্যতম সেরা দেশ না হলেও ভদ্রতায় একমাত্র সেরা দেশ।

জাপানে ক্ষুদ্‌দার ছেলের বাড়ি থেকে মুসাশি শিনজো স্টেশনের কাছে কুরুসিমা মার্কেটে ক্ষুদ্‌দা রোজ বাজার করতেন। কিন্তু চিকেন আনতেন কুরুসিমা মার্কেটের উল্টো দিকের একটা দোকান থেকে। দোকানের মালিক বা অন্যান্যরা অত্যন্ত ভদ্র। ক্ষুদ্‌দা রোজ সন্ধ্যায় ওখানকার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে যান। একদিন ক্ষুদ্‌দা'কে রাস্তায় দেখতে পেয়ে দোকানের মালিক ক্ষুদ্‌দাকে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। ক্ষুদ্‌দার মনে হল হয়তো কিছু টাকা (ইয়েন) বাকি আছে, এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে চাইছেন। ক্ষুদ্‌দার শব্দভাণ্ডারে 'গোমেননাসাই', 'সুমিমাসেন' এবং 'আরিগাতো গোযাইমাস' ছাড়া আর বিশেষ কিছুই নেই। এই তিনটি শব্দ প্রয়োগ করেও কোনও কাজ হলনা। ক্ষুদ্‌দা ভাবছেন কত ইয়েন বাকি আছে সেটা সোজাসুজি বললেই তো হয়। কথা অসমাপ্ত রেখেই ক্ষুদ্‌দা ওখান থেকে চলে গেলেন। রোজ সন্ধ্যায় ঐ দোকানটাকে এড়িয়ে উল্টোদিকের রাস্তা দিয়ে দৌড়ে ঐ রাস্তাটা পাড় হতেন যাতে দোকানের মালিক আর বাকি ইয়েন চাইতে না পারে। সব শুনে ক্ষুদ্‌দার ছেলে একদিন ওই মালিকের কাছে জানতে চাইল কি হয়েছে। ক্ষুদ্‌দা দূর থেকে দেখলেন ওরা সবাই প্রচণ্ড হাসাহাসি করছে। বাকি থাকা ইয়েন শোধ করে দিলেই তো হয়, এত হাসাহাসির কি আছে? আসলে দোকানের মালিক বলতে চাইছিলেন কোনও এক বুধবার দোকানটা বন্ধ থাকবে, তোমার বাবার তো বয়েস হয়েছে, কেন শুধু শুধু কষ্ট করে এখানে আসবেন! সেটাই নানারকম ভাবে তোমার বাবাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম। দাদা বৌদিকে বললেন, সত্যিই জাপান ভদ্র দেশ!

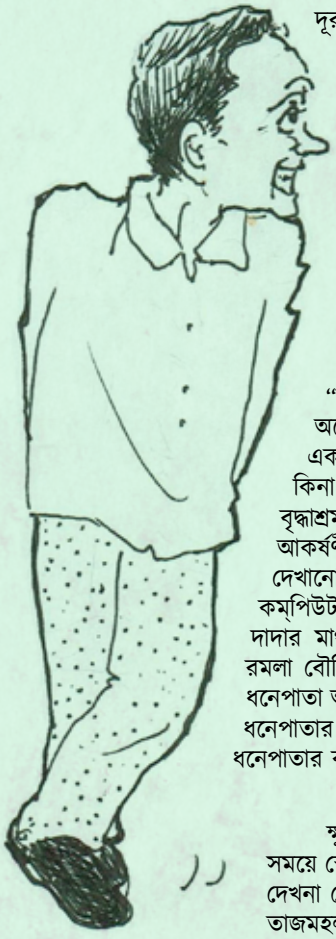

কয়েকদিন পরেই জাপানের প্রবাসী বাঙ্গালীদের দুর্গাপুজো অনুষ্ঠান হতে চলেছে। প্রত্যেক বছরই হয়, এবছরও হবে। এই পুজো উপলক্ষে শিল্প সাহিত্যে ভরপুর একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয় যার নাম "অঞ্জলি"। ক্ষুদ্‌দাকেও কিছু লিখতে বলা হয়েছে। দাদা অনেক ভাবনা চিন্তা করে ওই শারদীয়া পত্রিকার জন্য একটা জম্পেশ করে লিখতে শুরু করলেন। শেষ হবে কিনা বলা না গেলেও দাদা লেখার নাম দিলেন "মোঘল সাম্রাজ্য ও বৃদ্ধাশ্রম"। শৌখিন মোঘল সম্রাট শাহজাহানের শৈল্পিক চেতনাকে আরও আকর্ষণীয় করে লেখার জন্য, ময়ূর সিংহাসনকে আরও উজ্জ্বল করে দেখানোর জন্য, ময়ূর সিংহাসনের আরও অনেক ডেটা কালেকশনের জন্য কম্পিউটারের গুগুলের মধ্যে যখন পুরোপুরি মনোনিবেশ করে আছেন, দাদার মাথায় ময়ূর সিংহাসন ছাড়া আর কিছুই নেই, ঠিক সেই সময় রমলা বৌদি দাদাকে ধমকের সুরে বললেন, "তোমাকে না বাজার থেকে ধনেপাতা আনতে বলেছিলাম"। ময়ূর সিংহাসনে পৃথিবী বিখ্যাত কোহিনুর ছিল, ধনেপাতার নির্যাস ছিল কি? ভাবতে অবাক লাগছে ময়ূর সিংহাসনের পাদদেশে ধনেপাতার কৃষিকাজ!

ক্ষুদ্‌দা রমলা বৌদিকে বোঝাচ্ছিলেন আমাদের সবাইকে সঠিক সময়ে স্বেচ্ছায় বা বাধ্যতামূলকভাবে ওল্ডএজ হোমে চলে যেতে হয়। এই দেখনা মোঘল সম্রাট শাহজাহান কত শিল্পী মানুষ ছিলেন। তাঁর বানানো তাজমহল কয়েকশো বছর ধরে সারা পৃথিবীর লোক দেখতে আসছে। টাঙ্গা, অটো আর রিক্সা চালকদের কত রুজিরোজগার হচ্ছে। স্থানীয় দোকান থেকে কত নকল তাজমহল, পুতির মালা বিক্রীর মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতি কত সুদৃঢ় হচ্ছে। অথচ সেই সম্রাট শাহজাহানকেই আগ্রার দুর্গের ওল্ডএজ হোমে যেতে হয়েছিল।

রমলা বৌদি বললেন, রাজা দশরথও তো বৃদ্ধাশ্রমে গিয়েছিলেন। ক্ষুদ্‌দা বললেন, রাজা দশরথের কেসটা একটু অন্য রকমের। রাজা শুধু মৃগয়া করেই দিন কাটাচ্ছিলেন। নিজের দেশের ইন্টেলিজেন্স, গোয়েন্দা বিভাগ যে অকর্মন্য হয়ে যাচ্ছে সেটা উনি টেরই পাননি। আগে টের পেলে কৈকেয়ীর খাস চাকরানী মন্থরাকে অযোধ্যা রাজ্যের বাইরে স্নো হোয়াইটের মত কোন এক গভীর জঙ্গলে পাচার করে দিতেন। রাজা দশরথের বৃদ্ধাশ্রমে যাওয়ার প্ল্যানের ক্যালকুলেশনে এত ভুল ছিল যে উনি স্বেচ্ছায় ওল্ডএজ হোমে গেলেন, তবে কাঁদতে কাঁদতে। লোকে বলে অন্ধমুনির অভিশাপ। ওসব বাজে কথা। শার্লক হোমস্, ব্যোমকেশ বক্সী, ফেলুদারা তখনও হয়তো কাজে যোগদানই করেননি।

ক্ষুদ্‌দা বললেন, দেখ রমলা, সাধে কি বলি জাপানের মত দেশ হয় না। জাপানের সম্রাট আকিহিতো ২০১৯ সালে তার বিশাল সাম্রাজ্য পরবর্তী প্রজন্ম নারুহিতোর হাতে ছেড়ে দিয়ে বর্তমানকে বিদায় জানিয়ে সাম্রাজ্যের অতীতের ঘরে চলে গেলেন।

বৌদি বললেন, আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতাদের, রাষ্ট্রনায়কদেরও তো ওল্ডএজ হোমে যেতে দেখেছি। দাদা বললেন, আরে ওনাদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠায় জনগণ। বিগত বছরগুলোতে ওই নেতা বা নেত্রী জনগণের জন্য কি কি কাজ করেছেন বা করেননি, কি রকম ব্যবহার করেছেন, কাটমানির পরিমাণ কত ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে ওল্ডএজ হোমের নির্ঘন্ট। ওখানে ঔরঙ্গজেব বা মন্থরার কোন কারসাজি নেই। তবে হ্যাঁ, গান্ধীজী পড়াশুনা করা লোক তো, জীবনে রাষ্ট্রনায়ক হননি, কিন্তু জাতির জনক হয়ে পুত্র কন্যাদের জন্য রিজার্ভব্যাঙ্ক কর্তৃক মুদ্রিত দেশের টাকার ওপর নিজের ছবি ছাপিয়ে আজীবন থেকে গেলেন। টাকাকে কি কেউ বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাতে পারে?

রমলা বৌদি প্রায় কাঁদতে কাঁদতে ক্ষুদ্‌দা'কে বললেন, "আমি পুজোর সময় দামী শাড়ি কিনে দেওয়ার জন্য তোমার কাছে যতই বায়না করি না কেন, আহিড়ী টোলায় বাপের বাড়ি গিয়ে প্রচুর বাজে খরচ করলেও, খারাপ বাজার করার জন্য তোমার সঙ্গে অযথা ঝগড়া করলেও, আমি তো তোমার অর্ধাঙ্গিনী, আমাকে কি বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাবে? ক্ষুদ্‌দা বললেন, "তোমার মাথায় কী আছে বলো তো? কোন দিন কি দেখেছ স্বামী তার স্ত্রীকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়েছে? বৌ ছাড়া বর'কে রান্না করে খেতে দেবে কে? বাড়ির হোম ডিপার্টমেন্ট তো স্ত্রীরাই সামলায়। শত অসুবিধা থাকলেও, রণমূর্তি ধারণ করলেও, কালনাগিনীর মত মাঝে মাঝে ফনা তুললেও স্ত্রীদের কেউ কখনও বৃদ্ধাশ্রমে পাঠায়নি। ঘন্টায় ঘন্টায় চা-কফি কে করে দেবে, একটানা বৃষ্টিতে খিচুড়ি পাঁপড়ভাজা, ইলশেগুড়ি বৃষ্টিতে ইলিশ মাছের পাতুরি, গরমকালে আমের টকডাল, রান্না করা শাকে কাসুন্দির মিশ্রণ ইত্যাদি কে করে দেবে? এই সুবিধাগুলো ভগবান একতরফাভাবে তোমাদের দিয়েছেন বলে অসহায় স্বামীদের ল্যাজে খেলাও। তোমাদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর কথা স্বামীরা চিন্তাই করতে পারে না। কিন্তু উল্টোটা হয় কিনা জানা না থাকলেও শেক্সপিয়ারের অত্যন্ত কাছের একজন, যিনি ডার্ক লেডি নামে পরিচিতা, একদিন শেক্সপিয়ারকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেলেন এবং একবারও চিন্তা করলেন না শেক্সপিয়ার কি খাবেন, ফায়ারপ্লেসের কাঠ কিনতে হবে কিনা, শীতের জন্য গরম জামা আরও কিনতে হবে কিনা, কাগজ-কলম মজুত আছে কিনা ইত্যাদি।

ক্ষুদ্‌দা ভাবছিলেন বৃদ্ধাশ্রমে পাঠায় তো বৃদ্ধ বৃদ্ধার ছেলেমেয়েরা, আর রাজনৈতিক নেতাদের পাঠায় জনগণ। আহিড়ী টোলায় ক্ষুদ্‌দা'র শ্বশুরবাড়িতে দাদার অনেক শ্যালক শ্যালিকা থাকলেও তারা কেউই খারাপ নন, "শালা"তো ননই। দাদার ভবানীপুরের বকুল বাগান রোডের বাড়িতে দাদার ছেলে প্রমোটারের সঙ্গে হাত মেলাতে জাপান ছেড়ে নিশ্চয়ই আসবে না।

বৌদির আশংকা বৌদির পিসতুত বোন মীনাক্ষী গুহ ক্যালিফোর্নিয়ায় অথবা ওদের বহুদিনের সাথী সুপ্রকাশ সামন্ত বোস্টনে পার্মানেন্টলি থেকে গেছেন। এগুলো কি বৃদ্ধাশ্রম নয়? এগুলোকে ঠিক বৃদ্ধাশ্রম বলা না গেলেও উন্নতমানের পরাধীন আশ্রম তো বলা যেতে পারে। ইচ্ছে মতন গড়িয়াহাটে যদি নাই যাওয়া যায়, পাড়ার সোনার দোকানে কানের তিনটে ভাঙা দুল দিয়ে যদি একটা নাকছাবি নাই বানানো যায়, পাশের বাড়ির মিসেস পাকড়াশির সঙ্গে পরনিন্দা পরচর্চার মুখরোচক জম্পেশ আড্ডা যদি নাই দেওয়া যায়, মনের আনন্দে ফুচকা যদি নাই খাওয়া যায়, তাহলে বাস্তব পরাধীন জীবনের সঙ্গে কি তফাৎ?

দাদা বোঝালেন, আরে বাবা, আমেরিকার সরকারের কাছে ওখানকার স্থায়ী আবাসিকেরা যদি প্রশাসনের কাছে নাকে কান্না কেঁদে বলে আমাদের বৃদ্ধ বাবা-মায়েদের দেখার কেউ নেই, তখন কিছুদিন পরে ওই বাবা-মায়েদের ওখানে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। সেগুলোকে মর্ডান বৃদ্ধাশ্রমও বলা যেতে পারে। কিন্তু জাপানে হাজার বার কান্নাকাটি করলেও তিন মাসের বেশি ভিসা মঞ্জুর হয় না। তোমার বৃদ্ধ বাবা-মাকে দেখাশোনার জন্য তুমি বরং দেশেই ফিরে যাও।

বৌদি বললেন, যাক্ বাবা, এ জীবনে বৃদ্ধাশ্রমে যাওয়ার চিন্তা থেকে বাঁচলাম। জাপান সরকারকে শতকোটি নমস্কার জানাই!

বিসর্জনের ঢাক বাজছে

- হেমন্ত কুমার সরকার

বিসর্জনের ঢাক বাজছে,
চারিদিকে শুধু লালের খেলা –
সিঁদুরে সবাইকে রাঙাচ্ছে সধবারা।
ওদেরই স্বজাতি আজ যাচ্ছে চলে
ওরা রাঙাবে না তো রাঙাবে কারা ?

বিসর্জনের ঢাক বাজছে –
প্রতিমার ঘাম-তেলের ওপর
সিঁদুরের রঙ লেগেছে। ঠিক যেন
চোখের জলের সাথে সিঁদুরের মাখামাখি --
শ্বশুরবাড়ি যাবার দিন নববিবাহিতার যেমন হয়।

বিসর্জনের ঢাক বাজছে –
এদিকে একদল ছেলে
ঢাকের সাথে লাগিয়েছে নাচ –
'এই তো শেষ, আবার তো সেই বছর ঘুরলে –
এখন না নাচলে আর নাচবো কখন ?'
কিছু কিশোরী দল বেঁধে দাঁড়িয়ে
দেখছে ওদের সেই নাচ।
ওরা একদিকের ভীড় সরিয়ে
সুযোগ করে দিয়েছে এদের দেখার।
এদের চোখে-মুখে বিসন্নতার ছাপ,
কিন্তু তবুও ফিসফিসিয়ে
কানাকানি করছে এরা -
আর হাসি আনছে মুখে।
ওরাও চেষ্টা করছে হাসার -
আর তো সুযোগ নেই
সকাল থেকে রাত পর্যন্ত
প্যান্ডেলে বসে থাকার।

বিসর্জনের ঢাক বাজছে –
আজই তো শেষ দিন এবারে,
সেই বছর ঘুরলে আবার।
আসছে বছর হয়তো
এ সুযোগ আসবে না আর !
আজই তো শেষ দিন এবারে
একসঙ্গে প্যান্ডেলে থাকার।

বিসর্জনের বাজনা বাজছে -
সবার মুখ দেখে মনে হচ্ছে
যেন কিছু একটা হারিয়ে গেছে।

স্বাধীনতা পুজো

- বিশ্বনাথ পাল

স্বাধীন দেশে আমরা স্বাধীন
আনন্দে তাই নাচছি তাধিন,
ঢোলক বাজে তাক ধিনা ধিন
আমরা স্বাধীন আমরা স্বাধীন।

স্বাধীনতার উদযাপনে
নতুন জামা আনো কিনে,
সাদা কিংবা গেরুয়া পরো
সবুজ... একটু আড়াল কর,
খাদির পোশাক আজকে ফ্যাশ্যন
স্বাধীনতা মোদের প্যাশ্যন।

স্বাধীনতার মহোৎসবে
ভূরিভোজন ভালোই হবে,
সঙ্গে আছে অমৃতরস
স্বাধীনতা মানাচ্ছি বস।
শব্দদূষণ... বল্লে হবে?
স্বদেশি গান শুনবে কবে?

শহীদবেদি তৈরি আছে
পাড়ার মোড়ে ক্লাব এর কাছে,
গাঁদা ফুলের মালার ভারে
গান্ধী – সুভাষ চাপা পরে।
ফ্লাগ তুলবে পাড়ার দাদা
মোটা টাকা দিয়েছে চাঁদা।

ওইযে দেখো ঝাণ্ডা হাতে
মিছিল করে দিনে রাতে,
শিক্ষা চাই ...চাকরি চাই...
আন্দোলনে গলা ফাটাই। ...
আরে বাবা স্বাধীন দেশে
থাকলে একটু কষ্টে ক্লেশে।

সবাই কি আর চাকরি পাবে?
সবাই যদি লায়েক হবে
তবে...আমার ঘরে বাসন মাজা
মাথায় করে ইটের পাঁজা
বইবে কে আর সেটা বলো?
দোষ কি শুধু দিলেই হোলো?

এইরে... বেশি বলছি বোধহয়
মনের মাঝে ভয় যে সিধোয়,
কখন কে যে রিপোর্ট করে
পাঠিয়ে দেবে মামার ঘরে।
তারচে বরং চুপটি থাকি
ছেঁড়া কাঁথায় স্বপ্ন দেখি।

স্বাধীনতা শুনতে ভালো
কিছু আলো ... কিছু কালো।
যত্ন করে রাখবে তাকে
সারা বছর সিন্দুকেতে
তারপর এক বিশেষ দিনে
তেরঙ্গা আর স্বদেশি গানে
স্বাধীনতার পুজো সেরে
জয় হিন্দ আর স্যালুট মেরে
ফেসবুকেতে স্ট্যাটাস দিয়ো
"স্বাধীনতার শুভেচ্ছা নিয়ো"।।

নেতাজী

- অরুণ গুপ্ত

নেতাজীর মৃত্যু নেই
মৃত্যু হয় না বীরের
মধ্যমণি থাকুন তিনি
বিপ্লবীদের ভীড়ে।

স্বাধীন ভারত হয়নি তোমার
নিজের চোখে দেখা
তোমার হাতে তার বুনিয়াদ
পেয়েছে রূপরেখা।

তোমার মত, তোমার পথ
তোমার আদর্শ
সেই আদলে উঠুক গড়ে
নতুন ভারতবর্ষ।

মুক্তি

- বাবীয়া চন্দ

মুক্তি কোথায় আছে জানো?
মুক্তি আছে মনে।
বাইরে যতই বাধা আসুক
যুঝবো তারই সনে।

গাছকে দেখো, গাছে জল দাও,
সাড়া পাবেই পাবে।
পশু প্রানীকে ভালোবাসো,
প্রতিদান সে দেবেই দেবে।

গাছের সাথে, ফুলের সাথে
কথা বোলো,
শুনবে সে কান পেতে।
সুরের ভেলায় ভেসে যেও,
পাবে সেই সুখ পাবে।

মনের কথায় কবিতা লেখো,
রইবে না কেউ সেথা।
একা একাই মনের মুক্তি
মিলবে যে রে হেথা।।

হৃদি মাঝারে

- সুব্রত বনিক

মানুষের মন হয় কেন এতো সংকীর্ণ-
হয় না কেন তা উদারতায় ভরা,
যদি মনটি হত সীমাহীন আকাশের মতো -
তবে থাকতো ভেসে তাতে চন্দ্র সূর্য তারা।
ভেসে বেড়াতো মেঘ সাদা পালকের মতো
হাসতো জোছনা রাতে তারারা মিটিমিটি চোখে
কোজাগরীর আলোয় উদ্ভাসিত হত মন,
রবির ভোরের কিরণ উদ্ভাসিত হত মুখে।
ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসে শীতল হত মন,
যদি থাকে খোলা মন-বাতায়ন
চিত্ত হত আনন্দে উদ্বেলিত,
যদি দেয় দোলা মনে রবির কিরণ।
বৃষ্টি পড়ত ইলশেগুঁড়ি হয়ে
তোমারি কালো কুন্তল কেশে,
রাঙা হয়ে উঠতো তোমার মুখ কৃষ্ণচূড়ার মতো
টোল ফেলে তুমি পড়তে গড়িয়ে হেসে।
ছোট্ট অতি তুচ্ছ কারণে কেন এতো ঝগড়া
কেন এতো কম সহনশীলতা,
সম্পর্ক থাকে দাঁড়িয়ে পারস্পরিক বিশ্বাসে,
ভালোবাসা শ্রদ্ধা ভরসা মনকে দেয় উদারতা।
মন যদি হয় "মজা" নদীর মতো
তাতে জমে ওঠে জঞ্জাল,
একান্ত আপনও হয়ে যায় পর
অচিরেই কেটে যায় জীবনের তাল।

বোধিজ্ঞানের পূর্বাবস্থা

- কৌশিক ভট্টাচার্য্য

দুর্নীতি আর জুলুমবাজি সারাটা দেশ জুড়ে
আপনমনে হাসি, ভাবি, বিচিত্র এ' দেশ।
এ' চিন্তাটা তাও কেন যে মাথায় আসে উড়ে!
বিচিত্র কি আমি, নাকি মধ্যবয়েস শেষ?

দেখা যদি না-ই হতো

- বেবী বসু গুপ্ত

কী হতো বলো
যদি দেখা না-ই হতো কোনও দিন আমাদের?
যদি পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে তুমি থাকো
অন্য কোনও সাগরের পাড়ে
অথবা অন্য কোনও দ্বীপে থাকি আমি।

অথবা অন্য কোনও যুগে ছিলে তুমি
কয়েক শতক আগে পরে
পৃথিবীতে এসেছিলাম তুমি আর আমি —
তোমার যুগের কথা জানা গেল ইতিহাসে,
পুরাতত্বে, খনিত মাটির গভীরে,
দেখা তাই হোল না কখনও।

দেখা যদি না-ই হতো —
পদ্মার ওপাড়ে আমার বাড়ী
জলে-কাদায় মাখামাখি
বর্ষার ভাঙনের ভয়ে দিন কাটে
এপারে তোমার অট্টালিকা থেকে
দেখা যায় অপসৃয়মান গাঢ় কালো মেঘ
ভেসে এসে ছায়া ফেলে আমার কুটিরে
দেখা তবু হোল না দুজনে!

দেখা যদি না-ই হতো কোনও কারণে —
কে না জানে, দেখা হয়ে যাওয়া
এক অবাক বিস্ময়,
অনিশ্চিত জীবনের নিশ্চিত আলো-রেখা যেন
দেখা যদি না-ই হতো কী বলার ছিল!

দেখা হলে, তাই বুঝি এত ভালো লাগে!!

নৈশ ভোজ

- শান্তনু চক্রবর্তী

চতুর্দিকে বাজছে ডঙ্কা, যুদ্ধ হবে শুরু
রথের উপর রাবণ রাজা, পেট টা গুরু গুরু
গত রাতের গুরুপাক টা, মানতে চায়নি পেট
এই সময়ে দিচ্ছে জানান, করবে মাথা হেট্।

কৃষ্ণনগর হতে আনা সরভাজা টাই দোষী
শেষ পাতে তা খেয়ে তখন হয়েছিলেন খুশি
নাকি নলেন গুড়ের পায়েস, হচ্ছে এখন যম
বেনারস এর ল্যাংড়া আমটি, সেই বা কিসে কম।

জেলুসিল এর গোটা বোতল গলায় ঢালাই কাল
হয়নি দেখা expiry, মনে হয় ভেজাল
পেটের মধ্যে জোট বেধেছে, মিষ্টি, পায়েস, আম
জাল ঔসধি'র কিই বা সাধ্য, ছুটছে যে কাল ঘাম।

ইন্দ্রজিৎটা ভ্যাকেশনে, কুম্ভকর্ণ ঘুমে
কাকে বা দেই দায়িত্বটা, ডাকছে যেন যমে
ভাবছি পাঠাই রাম এর কাছে, একটি ভগ্ন দূত
আজ "আব্বুলিশ", আগামী কাল, লড়াই হবে জুৎ।

ঘরের শত্রু বিভীষণটা, দিল যে মন্ত্রণা
আব্বুলিশ চলবে নাকো, যতই হোক যন্ত্রণা
এই না শুনে রাম বাবাজি, বাজিয়ে দিলেন শাঁখ
নিরুপায় হয়ে রাবণ, বাজালেন তার ঢাঁক।

পেটের জালায় কাতর রাবণ, করেন ভারী যুদ্ধ
বানর সেনা বড্ড জালায়, মারবেন সব সুদ্ধ
রাম আবার স্কিম করে, লেলিয়ে দিলেন হনু
লেজ এর জোরে, দে পেটে চাপ, বিকল হলো তনু।

কাতর স্বরে সারথী রে, বলেন রাজা রাবণ
"রথ টা ঘোরাও, তা না হলে, আসবে হেথায় প্লাবন
পোশাক আশাক নষ্ট হবে, টিকবে না রে কেউ"
আজ্ঞা শুনে দেয় পিঠটান, পিছে সেনা'র ঢেউ

অবশেষে বাড়ি ফিরে গোসলখানায় যান
হালকা হলেন রাবণ রাজা, করেন আবার স্নান
মনে মনে নেন যে ব্রত, যুদ্ধ চলা কালে
রাতের খাবার সমঝে খাবেন, টকে এবং ঝালে